৪৫তম বিসিএস লিখিত ফুল কোর্স

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

লেকচার: ০৫

টপিক:

বায়োটেকনোলজি (Biotechnology): ক্রোমোসোম, ক্রোমোসোমের আকার-আকৃতি এবং রাসায়নিক উপাদান, নিউক্লিক অ্যাসিড, ডি-অক্সিরাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড (DNA), রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড (RNA), আমিষ, জিন, DNA টেস্ট, ফরেনসিক টেস্ট, মানুষের জেনেটিক বিশৃঙ্খলা, জীবপ্রযুক্তি ও জিন প্রকৌশল, ক্লোনিং, ক্লোনিংয়ের স্বাভাবিক প্রভাব, ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ ও প্রাণী, কৃষি, অরগ্যানিজম, ন্যানো প্রযুক্তি, ফার্মাকোলজি, ফার্মাকোকাইনেটিক্স।

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি
09666775566
www.uttoron.academy
একটি বুদ্ধিবৃত্তিক-উদ্যোগ প্রতিষ্ঠান

Transcription
(প্রতিলিপিকরণ)
DNA
↓
m-RNA
↓
t-RNA
↓
r-RNA (Ribosome)
↓
Protein
Translation
(অনুবাদ)
Language of Life
Design
DNA - নির্দেশনা বহন করে।
RNA - নির্দেশনা অনুযায়ী
Protein তৈরি
করতে সাহায্য করে।

ক্রোমোজোম

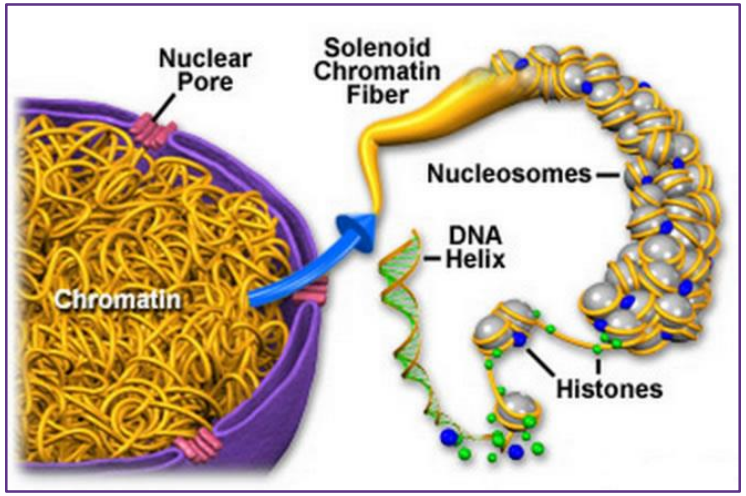
Nuclear Pore
Solenoid Chromatin Fiber
Nucleosomes
DNA Helix
Chromatin
Histones

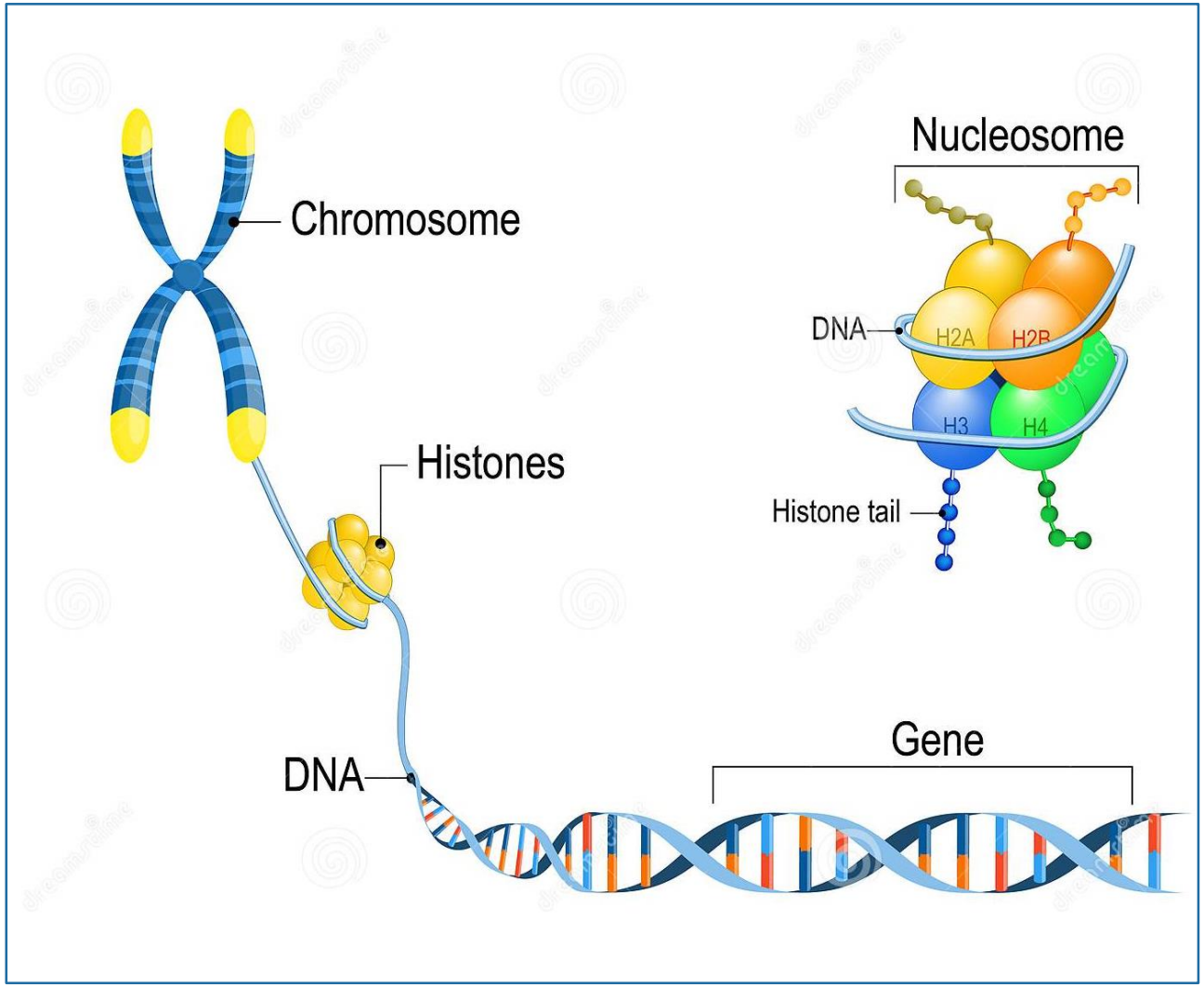
Chromosome
Histones
DNA
Gene
Nucleosome
DNA
H2A
H2B
H3
H4
Histone tail

ক্রোমোজোম

ক্রোমোজোমের ভৌত গঠন ও প্রকারভেদ

➢ সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থান অনুযায়ী ক্রোমোসোম চার প্রকার:-

মেটাসেন্ট্রিক

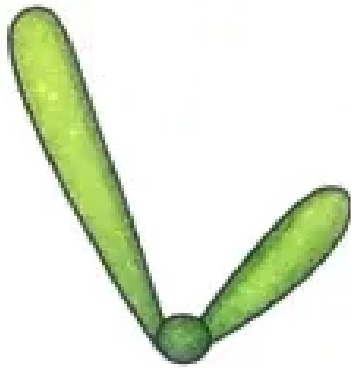

সাব-মেটাসেন্ট্রিক

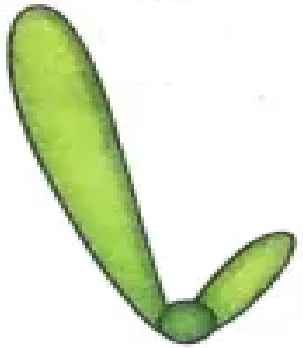

এক্রোসেন্ট্রিক

টেলোসেন্ট্রিক

ক্রোমোজোম

ক্রোমোজোমের ভৌত গঠন

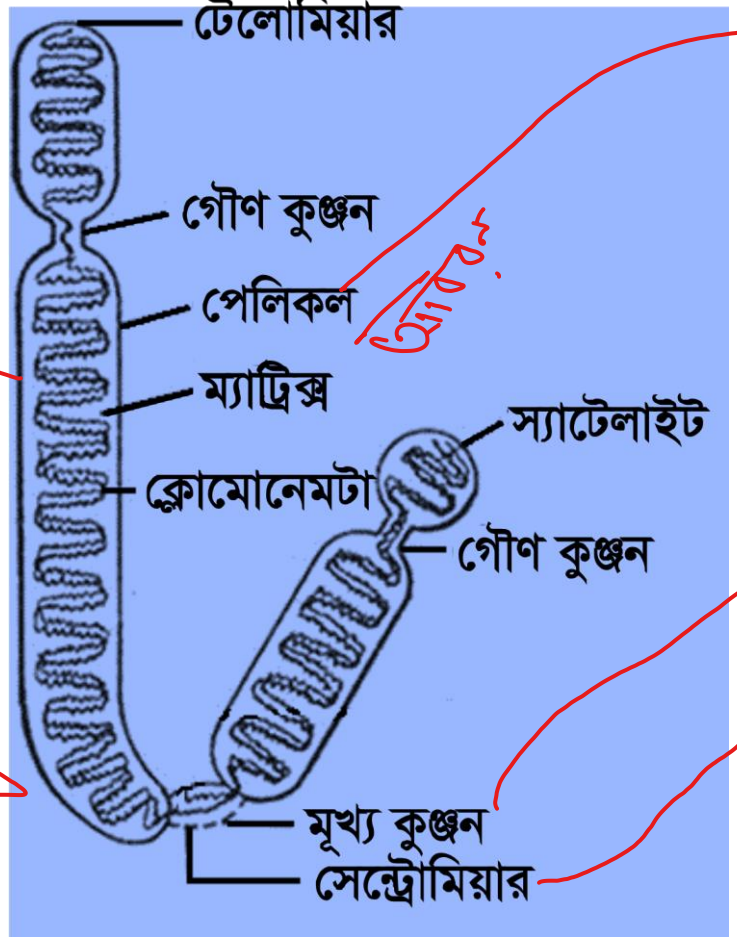

চিত্র: ক্রোমোজোমের ভৌত গঠন

ক্রোমোজোম

ক্রোমোজোমের রাসায়নিক গঠন:

❑ **নিউক্লিক এসিড:** যে বায়োপলিমার অণুসমূহ বংশগতির ধারা সংরক্ষণে এবং কোষস্থ প্রোটিন ও এনজাইম সংশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করে থাকে তাদেরকে নিউক্লিক এসিড বলে।

নিউক্লিক এসিড দুই প্রকার-

i. DNA (ডি অক্সিরাইবো নিউক্লিক এসিড)

ii. RNA (রাইবো নিউক্লিক এসিড)

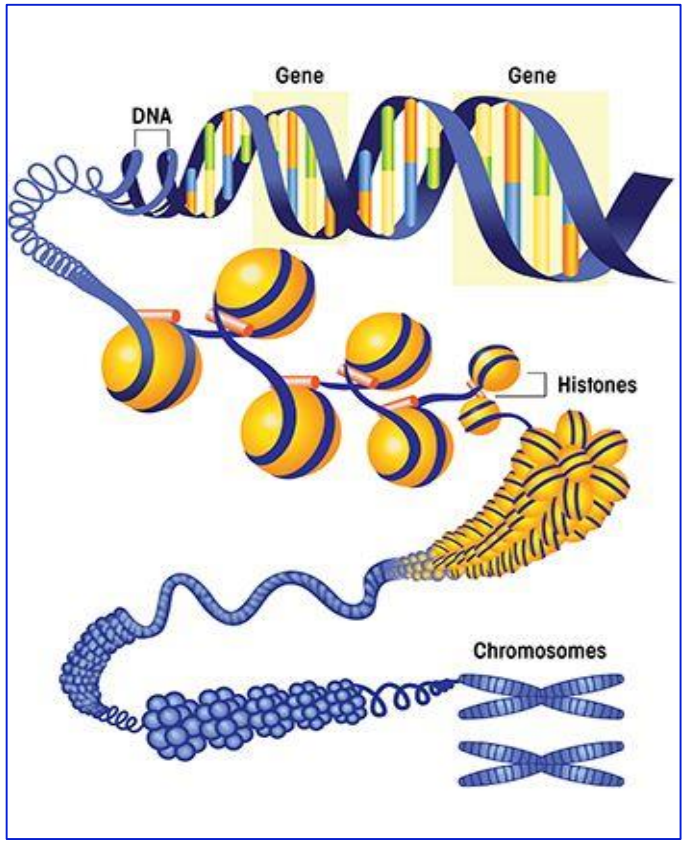

❖ **DNA:** DNA এর পুরো নাম Deoxyribo Nucleic Acid । DNA হলো ক্রোমোজোমের প্রকৃত স্থায়ী উপাদান। ক্রোমোজোমের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে এর পরিমাণ হচ্ছে শতকরা প্রায় ৪৫ ভাগ। এতে পাঁচ কার্বন বিশিষ্ট পেন্টোজ শর্করা, অজৈব ফসফেট, নাইট্রোজেনঘটিত ক্ষারক (অ্যাডিনিন, গুয়ানিন, থাইমিন ও সাইটোসিন) থাকে। ক্রোমোজোমে DNA ও হিস্টোন প্রোটনের অনুপাত ১ : ১।

ক্রোমোজোমের রাসায়নিক গঠন

❖ **RNA:** RNA এর পুরো নাম Ribo Nucleic Acid. ক্রোমোজোমে এর পরিমাণ হচ্ছে শতকরা ০.২–১.৪ ভাগ। RNA ক্রোমোজোমের স্থায়ী উপাদান নয়। প্রতিটি RNA সাধারণত একসূত্র বিশিষ্ট। এটি পাঁচ কার্বন বিশিষ্ট রাইবোজ শর্করা, অজৈব ফসফেট, নাইট্রোজেনঘটিত ক্ষারক (অ্যাডিনিন, গুয়ানিন, ইউরাসিল ও সাইটোসিন) দ্বারা গঠিত।

❑ **প্রোটিন:** প্রতিটি ক্রোমোজোমের মূল কাঠামো গঠনকারী রাসায়নিক উপাদান। এ কাঠামোতে নিউক্লিক এসিড বিন্যস্ত থাকে। ক্রোমোজোমে প্রোটিনের পরিমাণ শতকরা ৫৫ ভাগ। ক্রোমোজোমে দুই ধরনের প্রোটিন পাওয়া যায়। যথা:

❖ **নিম্ন আণবিক গুরুত্ব সম্পন্ন প্রোটিন:** ক্রোমোজোমে প্রোটামিন অথবা হিস্টোন-এ দুটি ক্ষারীয় প্রোটিনের মধ্যে যেকোনো একটি পাওয়া যায়। তবে বেশির ভাগ ক্রোমোজোমে হিস্টোন প্রোটিন থাকে। প্রোটামিন পাওয়া যায় শুধু শুক্রাণুর ক্রোমোজোমে। ক্রোমোজোমে হিস্টোনের পরিমাণ DNA-এর পরিমাণের কাছাকাছি।

❖ **উচ্চ আণবিক গুরুত্ব সম্পন্ন প্রোটিন:** ক্রোমোজোমে বেশ কয়েক ধরনের অম্লীয় প্রোটিন থাকে যাদের আণবিক গুরুত্ব তুলনামূলক বেশি থাকে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো DNA পলিমারেজ ও RNA পলিমারেজ।

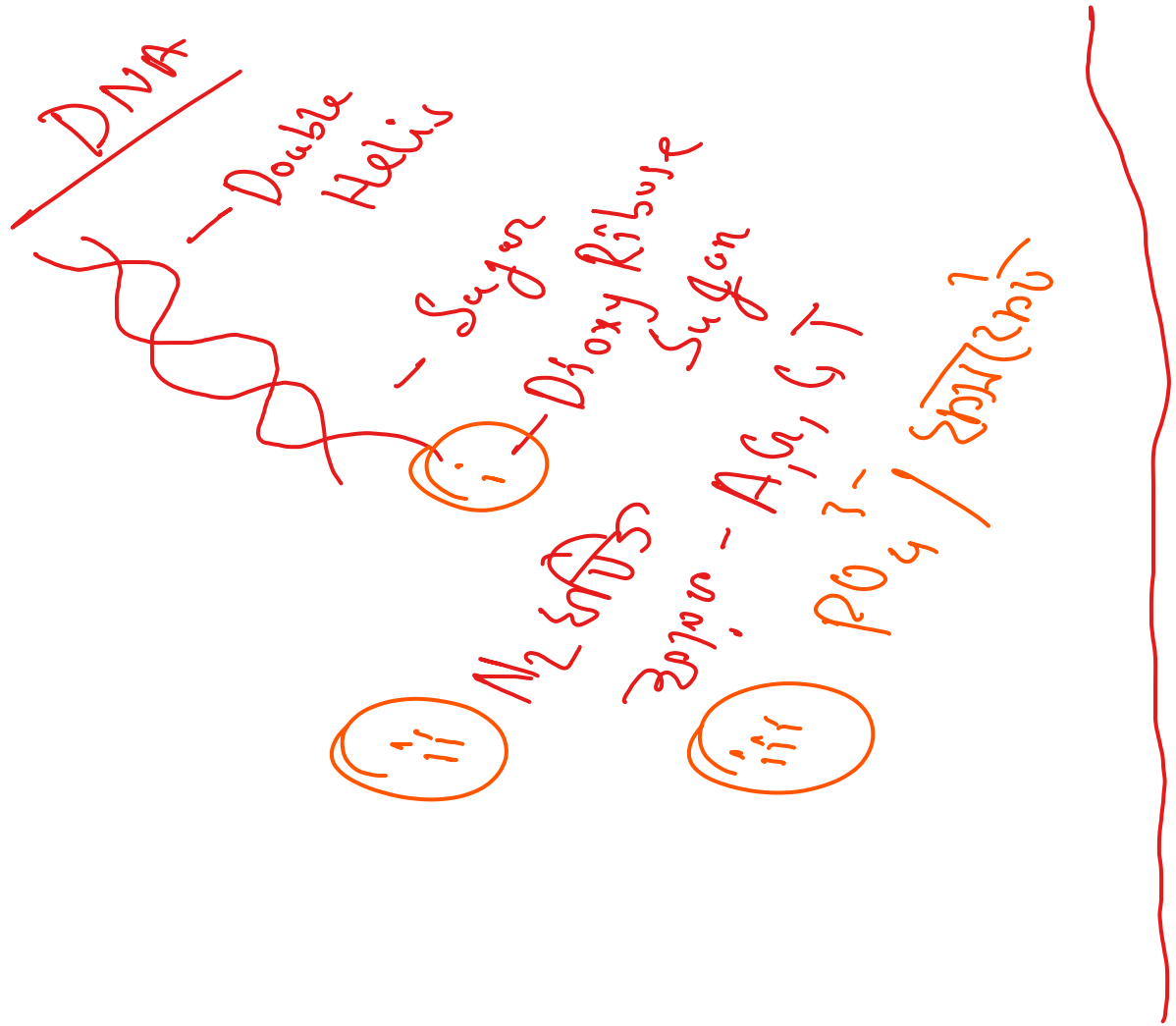
DNA
- Double Helix
- Sugar
Deoxy Ribose Sugar
(i)
(ii) নাইট্রোজেন - A, G, C, T
(iii) PO4 / ফসফেট

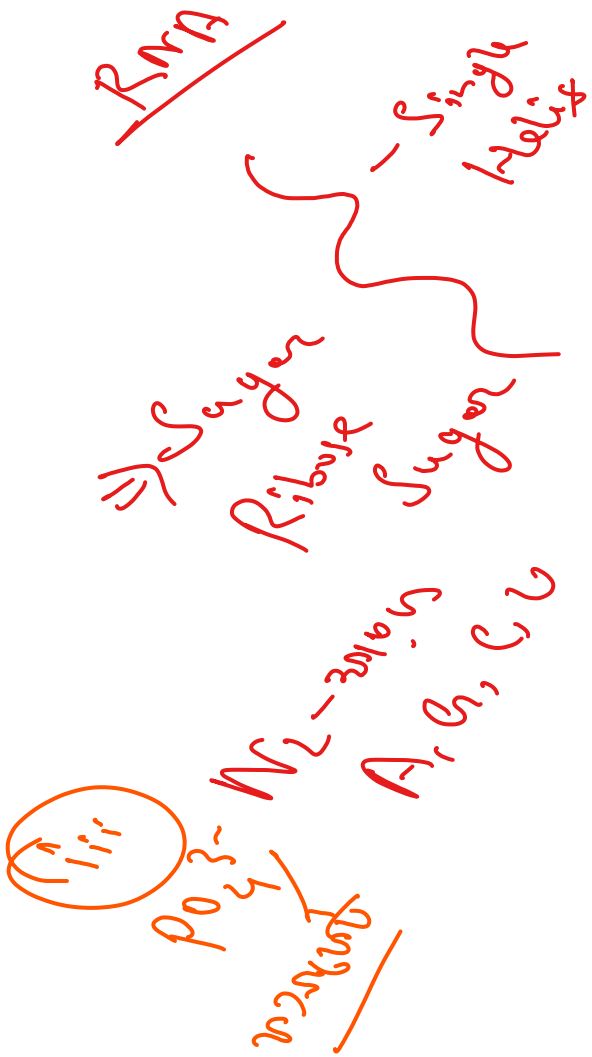
RNA
- Single Helix
Sugar
Ribose Sugar
(iii) PO4 / ফসফেট
N2 - নাইট্রোজেন
A, G, C, U

DNA

অণুর আকৃতি প্যাঁচানো সিঁড়ির মতো। প্যাঁচানো সিঁড়ির দুপার্শ্বের মূল কাঠামো গঠিত হয় নিউক্লিওটাইডের পাঁচ কার্বন যুক্ত শর্করা এবং ফসফেট দিয়ে। শর্করা ফসফেটের কাঠামোটি বাইরের কাঠামো। ভেতরে নিউক্লিওটাইডগুলো যুক্ত থাকে নাইট্রোজেনের ক্ষারক দিয়ে। চার ধরনের নাইট্রোজেন ক্ষারকের মধ্যে দুটি করে জোড় বেঁধে তৈরি করে সিঁড়ির ধাপগুলো। DNA অণুর চার ধরনের ক্ষারক হচ্ছে এডিনিন (A), গুয়ানিন (G), সাইটোসিন (C) ও থাইমিন (T) এর মাঝে এডিনিন সবসময় থাইমিনের সাথে (A-T) এবং সাইটোসিন সবসময় গুয়ানিনের সাথে (C-G) জোড়া বাঁধে। DNA এর প্যাঁচানো সিঁড়ির মতো কাঠামোকে ডাবল হেলিক্স বলা হয়ে থাকে।

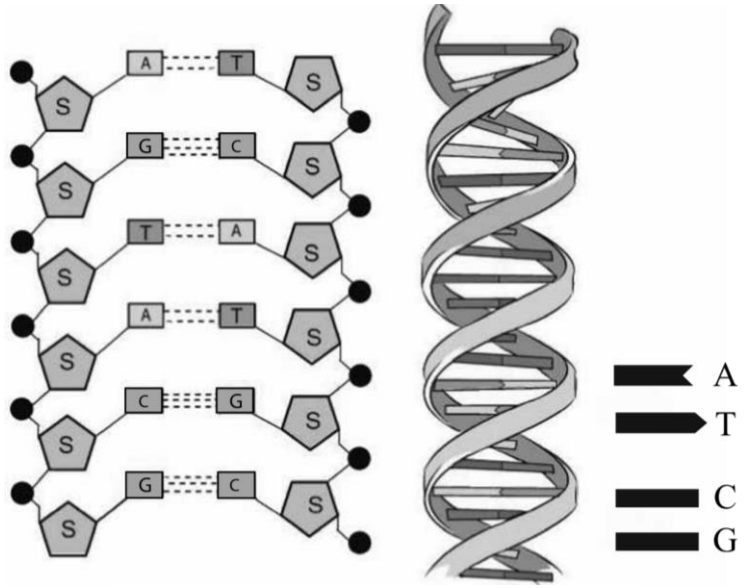

চিত্র: DNA অণুর গঠন

DNA

DNA এর কাজ:

- ✓ জীবের সকল বৈশিষ্ট্য ধারণ করে এবং নিয়ন্ত্রণ করে।
- ✓ বংশগতির আণবিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।
- ✓ ক্রোমোজোমের গাঠনিক উপাদান হিসেবে কাজ করে।
- ✓ জীবের বৈশিষ্ট্যসমূহ বংশপরম্পরায় পরবর্তী প্রজন্মে স্থানান্তর করে।
- ✓ জীবের যাবতীয় বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটায়।
- ✓ জীবের সকল শারীরতাত্ত্বিক ও জৈবিক কাজকর্মের নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করে।
- ✓ জীবের পরিবৃত্তির ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

আর.এন.এ (RNA)

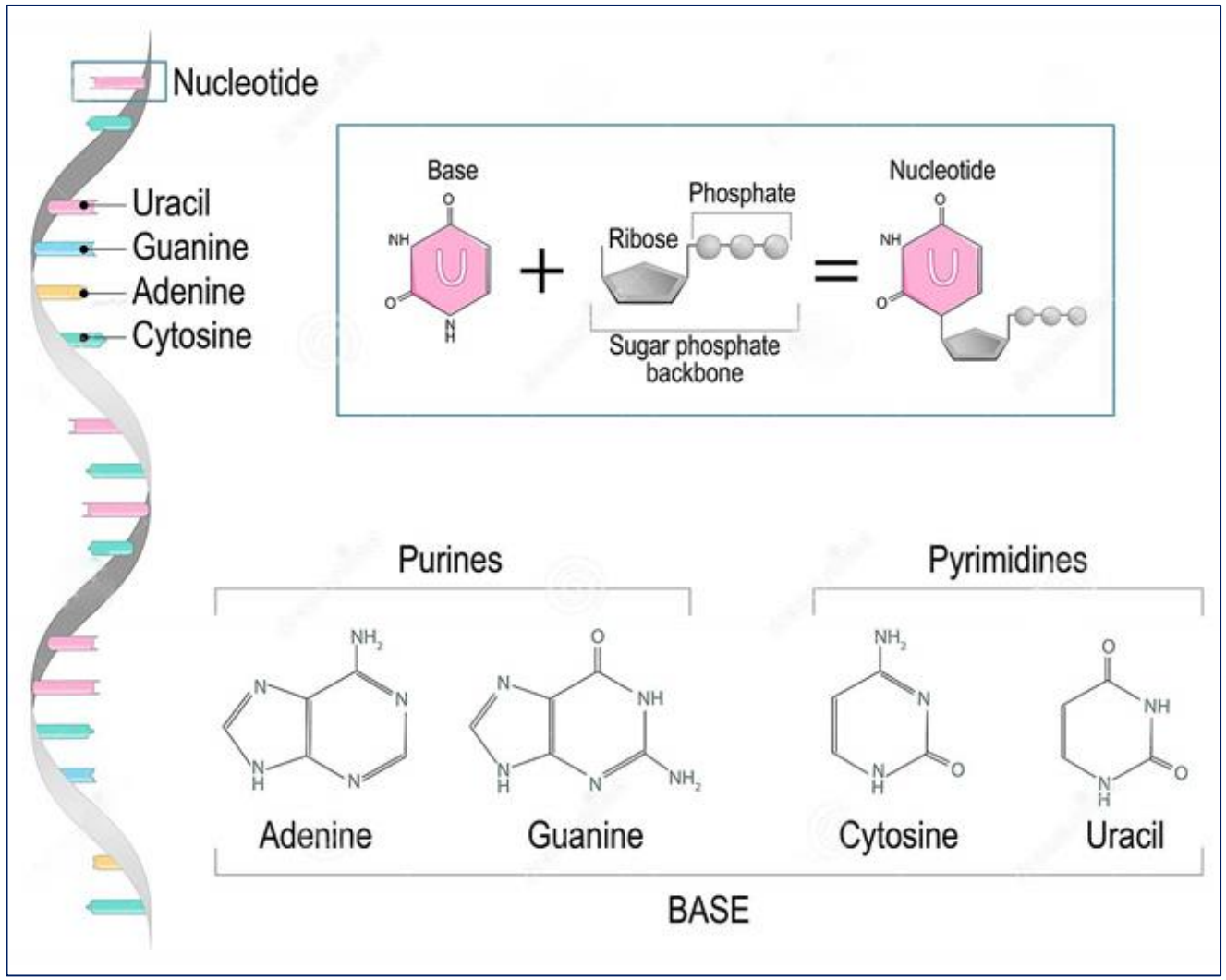

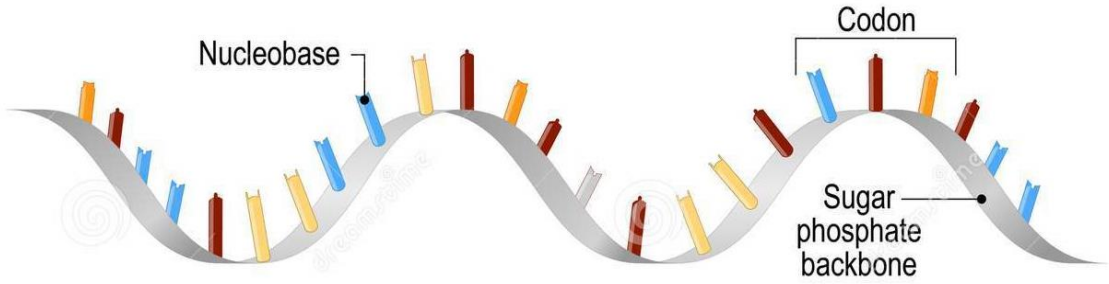

Messenger RNA

Transfer RNA

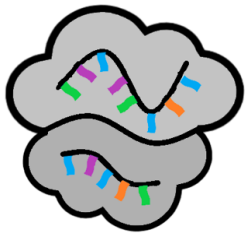

Ribosomal RNA

আর.এন.এ (RNA)

গঠন ও কাজের ভিত্তিতে RNA কে নিম্নলিখিত চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

- ✓ **t-RNA (ট্রান্সফার RNA):** যে সব RNA জেনেটিক কোড অনুযায়ী একেকটি অ্যামিনো অ্যাসিডকে m-RNA অণুতে স্থানান্তর করে প্রোটিন সংশ্লেষণে সাহায্য করে সেগুলোকে ট্রান্সফার বা t-RNA বলে।
- ✓ **r-RNA (রাইবোসোমাল RNA):** যে সব RNA রাইবোসোমের প্রধান গাঠনিক উপাদান হিসেবে কাজ করে, তাকে রাইবোসোমাল RNA বলে। কোষের সমস্ত RNA এর শতকরা ৮০-৯০ ভাগই r-RNA।
  কাজ: রাইবোসোম নামক কোষ অঙ্গাণু সৃষ্টিতে অবদান রাখে যার মাধ্যমে কোষে প্রোটিন সংশ্লেষিত হয়।
- ✓ **m-RNA (মেসেঞ্জার RNA):** যে সব RNA জিনের সংকেত অনুযায়ী প্রোটিন সংশ্লেষের ছাঁচ হিসেবে কার্যকর হয়ে নির্দিষ্ট অ্যামিনো এসিড অনুক্রম বাছাই করে, সেগুলোকে মেসেঞ্জার RNA বা বার্তাবহ RNA বলে।
  কাজ: নির্দিষ্ট প্রোটিন সংশ্লেষণের বার্তা নিউক্লিয়াস থেকে সাইটোপ্লাজমে বহন করে এবং রাইবোসোম ও t-RNA-র সাহায্যে নির্দিষ্ট অ্যামিনো এসিড অনুক্রমের শৃঙ্খল তৈরি করে।
- ✓ **g-RNA (জেনেটিক RNA):** যে সব RNA কিছু ভাইরাসদেহে বংশগতি বস্তু হিসেবে কাজ করে তাকে জেনেটিক RNA বলে।
  কাজ: প্রধানত প্রোটিন তৈরি করা।

আর.এন.এ (RNA)

DNA ও RNA এর মধ্যে পার্থক্য

DNA	RNA
১। দ্বিসূত্রক বিশিষ্ট প্যাঁচানো বা ঘুরানো সিঁড়ির আকৃতির।	১। এক সূত্রক বিশিষ্ট, শিকলের ন্যায় আকৃতির।
২। রাসায়নিক উপাদান: ডিঅক্সিরাইবোজ সুগার, ফসফোরিক অ্যাসিড এবং নাইট্রোজেন ঘটিত ক্ষারক- অ্যাডিনিন, গুয়ানিন, সাইটোসিন, থায়ামিন।	২। রাসায়নিক উপাদান: রাইবোজ সুগার, ফসফোরিক অ্যাসিড, নাইট্রোজেন ঘটিত ক্ষারক- অ্যাডিনিন, গুয়ানিন, সাইটোসিন, ইউরাসিল।
৩। DNA অণুর কোন প্রকারভেদ নেই।	৩। কার্যগত দিক থেকে RNA পাঁচ প্রকার। যথা: tRNA, mRNA, rRNA, gRNA, মাইনর RNA
৪। অনুলিপনের মাধ্যমে নতুন DNA তৈরি হয়।	৪। RNA নতুনভাবে সৃষ্টি হয় সর্বদা।
৫। DNA প্রধানত ক্রোমোজোমে থাকে। সামান্য পরিমাণে মাইটোকন্ড্রিয়া ও ক্লোরোপ্লাস্টেও থাকে।	৫। বেশির ভাগ RNA সাইটোপ্লাজমে থাকে। সামান্য পরিমাণে রাইবোজোম, মাইটোকন্ড্রিয়া, প্লাস্টিডেও থাকে।
৬। বংশগতির ধারক, বাহক ও নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করে।	৬। প্রোটিন সংশ্লেষণ করাই RNA এর প্রধান কাজ।
৭। বংশগত চরিত্র ও জীবের বৈশিষ্ট্য বহন করে।	৭। ভাইরাল RNA ছাড়া চরিত্র বা বৈশিষ্ট্য বহন করে না।

জিন

জিন [৩৮তম, ৩৫তম, ২৪তম, ১৫তম বিসিএস লিখিত]

জিন হলো ক্রোমোজোমের লোকাসে অবস্থিত DNA অণুর সুনির্দিষ্ট সিকুয়েন্স যা জীবের একটি নির্দিষ্ট কার্যকর সংকেত আবদ্ধ করে এবং প্রোটিন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটায়। অন্যভাবে বলা যায়, জিন ক্রোমোজোমস্থ DNA এর একটি অংশ, যা একটি কর্মক্ষম পলিপেপটাইড শিকল গঠনের উপযুক্ত বার্তা বহন করে।

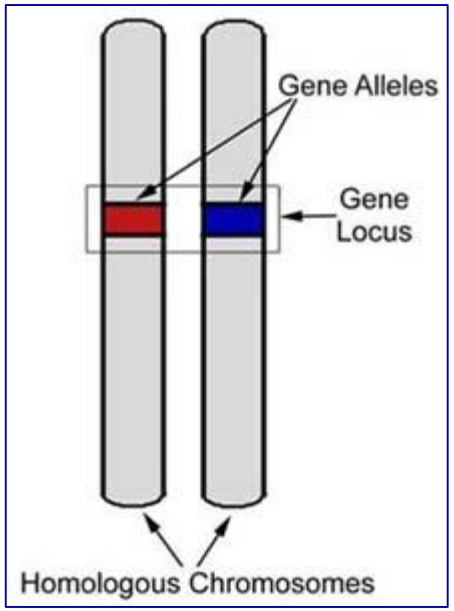

জিন মিউটেশন

❖ জিন মিউটেশনের কারণ---

১. এটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে পরিবর্তন হতে পারে।

২. পরিবেশগত উপাদানের কারণে হতে পারে।

৩. ভুল প্রতিলিপিকরণের মাধ্যমে।

৪. ভুল রিকম্বিনেশনের মাধ্যমে।

৫. UV রশ্মি, X-ray, গামা রশ্মির প্রভাবে হতে পারে।

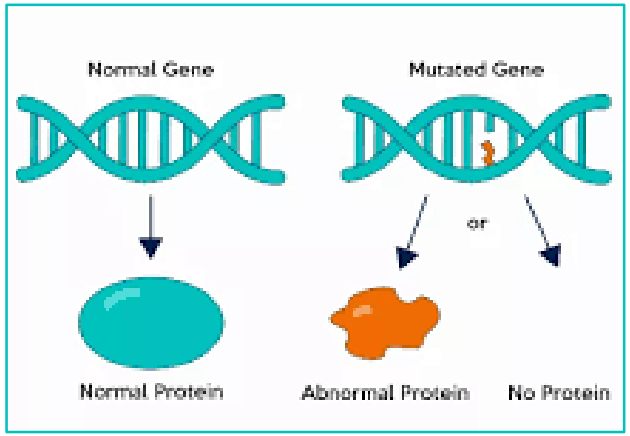

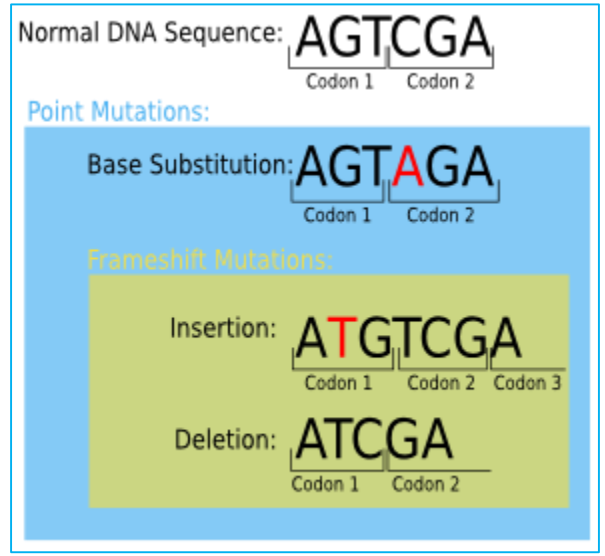

জিন মিউটেশন

পয়েন্ট মিউটেশন	ফ্রেমশিফট মিউটেশন
১. একটি জিনের একক নিউক্লিওটাইডের পরিবর্তন।	১. একটি বা একাধিক নিউক্লিওটাইড পরিবর্তন।
২. জিনের কাঠামোকে পরিবর্তন করে।	২. জিনে নিউক্লিওটাইডের সংখ্যা পরিবর্তন করে।
৩. নিউক্লিওটাইডের প্রতিস্থাপনের দরুন হয়।	৩. নিউক্লিওটাইডের যুক্তকরণ বা অপসারণের দরুন হয়।
৪. সিকেল সেল অ্যানিমিয়া পয়েন্ট মিউটেশনের কারণে ঘটে।	৪. টেই-স্যাকস রোগটি ফ্রেমশিফ্ট পরিবর্তনের ফলে ঘটে।
৫. দুই প্রকার : ১. ট্রাঞ্জিশান, ২. ট্রান্সভার্সন।	৫. দুই প্রকার : ১. সন্নিবেশ বা যুক্তকরণ, ২. অপসারণ।

জিন মিউটেশন

কিছু জেনেটিক বিশৃঙ্খলাজনিত রোগ:

✓ **সিকিল সেল (Sickle cell):** মানুষের রক্ত কণিকার এ রোগটি হয় পয়েন্ট মিউটেশনের ফলে। স্বাভাবিক লোহিত রক্ত কণিকাগুলো আকৃতিতে চ্যাপ্টা। কিন্তু সিকিল সেলের ক্ষেত্রে লোহিত কণিকাগুলোর আকৃতি কিছুটা কাস্তের মতো হয়। সিকিল সেলগুলো সূক্ষ্ম রক্তনালিগুলোতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এবং শরীরের সেই স্থানগুলোতে তীব্র ব্যথা অনুভূত হয়। এই রক্তকণিকাগুলো যত দ্রুত ভেঙে যায়, তত দ্রুত লোহিত রক্তকণিকা তৈরি হয় না বলে শরীরে রক্তশূন্যতা দেখা দেয়।

✓ **হানটিংটনস রোগ (Huntington's Disease):** এ রোগটিও হয় পয়েন্ট মিউটেশনের কারণে। এই রোগে মস্তিষ্ক ঠিকমতো কাজ করে না। শরীরের পেশিগুলোর মধ্যে সমন্বয় করার ক্ষমতা লোপ পায় এবং পরবর্তীতে মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে মৃত্যু ঘটে। এ রোগটির লক্ষণ আক্রান্ত ব্যক্তির বয়স চল্লিশ হওয়ার আগে প্রকাশ পায় না। মায়োসিস কোষ বিভাজনের সময় অ্যানাফেজ ধাপে হোমোলোগাস ক্রোমোজোমগুলোর যেকোনো একটি জোড়ায় ক্রোমোজোম দুটির একটি অপরটি থেকে পৃথক না হয়ে দুটিই যেকোনো মেরুতে চলে যায়। এ অবস্থাকে নন- ডিসজাংশন বলে। যেকোনো একটি বিশেষ ক্রোমোজোমের নন-ডিসজাংশন ঘটলে একসাথে বেশ কতগুলো লক্ষণ বা সিনড্রোম দেখা যায়।

জিন মিউটেশন

✓ **ডাউন'স সিনড্রোম (Down's Syndrome):** মানুষের ২১তম ক্রোমোজোমের নন-ডিসজাংশনের ফলে এ রোগ হয়। সে কারণে ডাউন'স সিনড্রোমের মানুষের দুটির বদলে তিনটি ২১ নম্বর ক্রোমোজোম থাকে। এদের চোখের পাতা ফুলা, নাক চ্যাপ্টা, জিহ্বা লম্বা এবং হাতগুলো তুলনামূলকভাবে ছোট হয়। এরা হাসিখুশি প্রকৃতির, খর্বাকৃতির এবং মানসিক পরিপক্কতা কম হয়।

✓ **থ্যালাসেমিয়া (Thalassemia):** রক্তের লোহিত রক্ত কণিকার অস্বাভাবিক অবস্থাজনিত একটি রোগ থ্যালাসেমিয়া। এই রোগে লোহিত রক্ত কণিকা নষ্ট হয়ে যায় ফলে রোগী রক্ত শূন্যতায় ভোগে। ১৬ ও ১১ নং ক্রোমোজোমের অস্বাভাবিক বৃদ্ধির ফলে লোহিত রক্ত কোষের A-গ্লোবিউলিন ও B-গ্লোবিউলিন তৈরির জিন অনুপস্থিত থাকে। A-গ্লোবিউলিন জিনের অভাবে A-থ্যালাসেমিয়া এবং B-গ্লোবিউলিন জিনের অভাবে B-থ্যালাসেমিয়া হয়।

জিনোম
DNA / Gene
পরিবর্তন
জেনেটিক্যালি মডিফাইড
GMF – Genetically Modified Food
Transgenic উদ্ভিদ/প্রাণী
GEO – Genetically Engineered Organism
Golden Rice
Bt তুলা – Sulphur
Zinc ধান

জীবপ্রযুক্তি (BIOTECHNOLOGY)

জৈবপ্রযুক্তি

[৪০তম, ২১তম, ১৫তম বিসিএস লিখিত]

U.S National Science Foundation এর মতে 'মানব কল্যাণে জৈবিক উপকরণ তথা: অনুজীব অথবা কোষীয় উপাদানের নিয়ন্ত্রিত ব্যবহারই Biotechnology. IUPAC প্রদত্ত সংজ্ঞায় বলা হয়েছে- 'জৈব প্রযুক্তি হলো শিল্পে প্রক্রিয়াজাতকরণ ও উৎপাদিত দ্রব্য এবং শিল্প পরিবেশের উপর প্রাণরসায়ন, জীববিজ্ঞান, অনুজীববিজ্ঞান এবং রসায়ন প্রকৌশলের প্রয়োগ।'

১৯৭০ দশকের গোড়ার দিকে যখন রিকম্বিন্যান্ট DNA-এর কার্যকারণ সূত্র আবিষ্কৃত হয়, তখনই বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত হয়ে যান ভবিষ্যতে তাঁরা প্রাণীজ ও উদ্ভিদ খাদ্যকে যেকোনো রকমভাবে পরিবর্তিত করতে পারবেন।

প্রকৃতপক্ষে এগুলো সম্ভব বায়োটেকনোলজি (Biotechnology) বা জৈবপ্রযুক্তির মাধ্যমে। কোন জৈবিক প্রক্রিয়া বা উহার অংশ বিশেষকে মানব কল্যাণে ব্যবহারের প্রযুক্তিকে বলা হয় বায়োটেকনোলজি বা জৈবপ্রযুক্তি (Biotechnology)। বায়োটেকনোলজি শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন হাঙ্গেরিয়ান কৃষি অর্থনীতিবিদ কার্ল ইরেকী (Karl Ereky) ১৯১৯ সালে। যদিও মানব সভ্যতায় জৈবপ্রযুক্তি তথা ফার্মেন্টেশন (Fermentation) বা গাঁজন প্রক্রিয়ায় অ্যালকোহল তৈরির পদ্ধতি অতি প্রাচীন, প্রায় পাঁচ হাজার বছরের পুরাতন। কিন্তু বায়োটেকনোলজি কেবলমাত্র সত্তর দশকের পর থেকে, অর্থাৎ আণবিক জীববিজ্ঞানের (Molecular Biology) কলাকৌশল ও আধুনিক শিল্পে তাদের প্রয়োগ প্রসার লাভের ফলে বহুলভাবে প্রচলিত হয়েছে। জীব প্রযুক্তির বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে বর্তমানে টিস্যু কালচার ও জিন প্রকৌশল পদ্ধতি বহুল ব্যবহৃত হচ্ছে।

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং

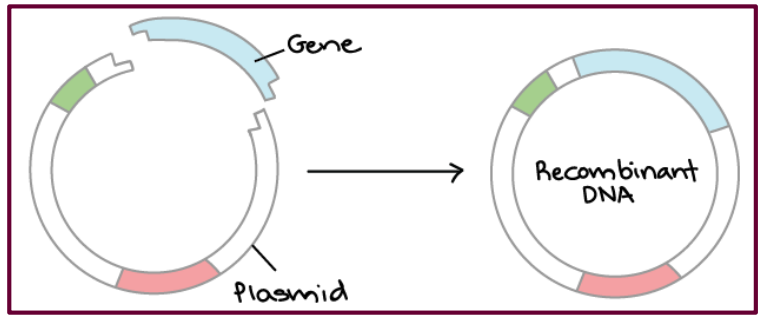
Gene
Recombinant DNA
Plasmid

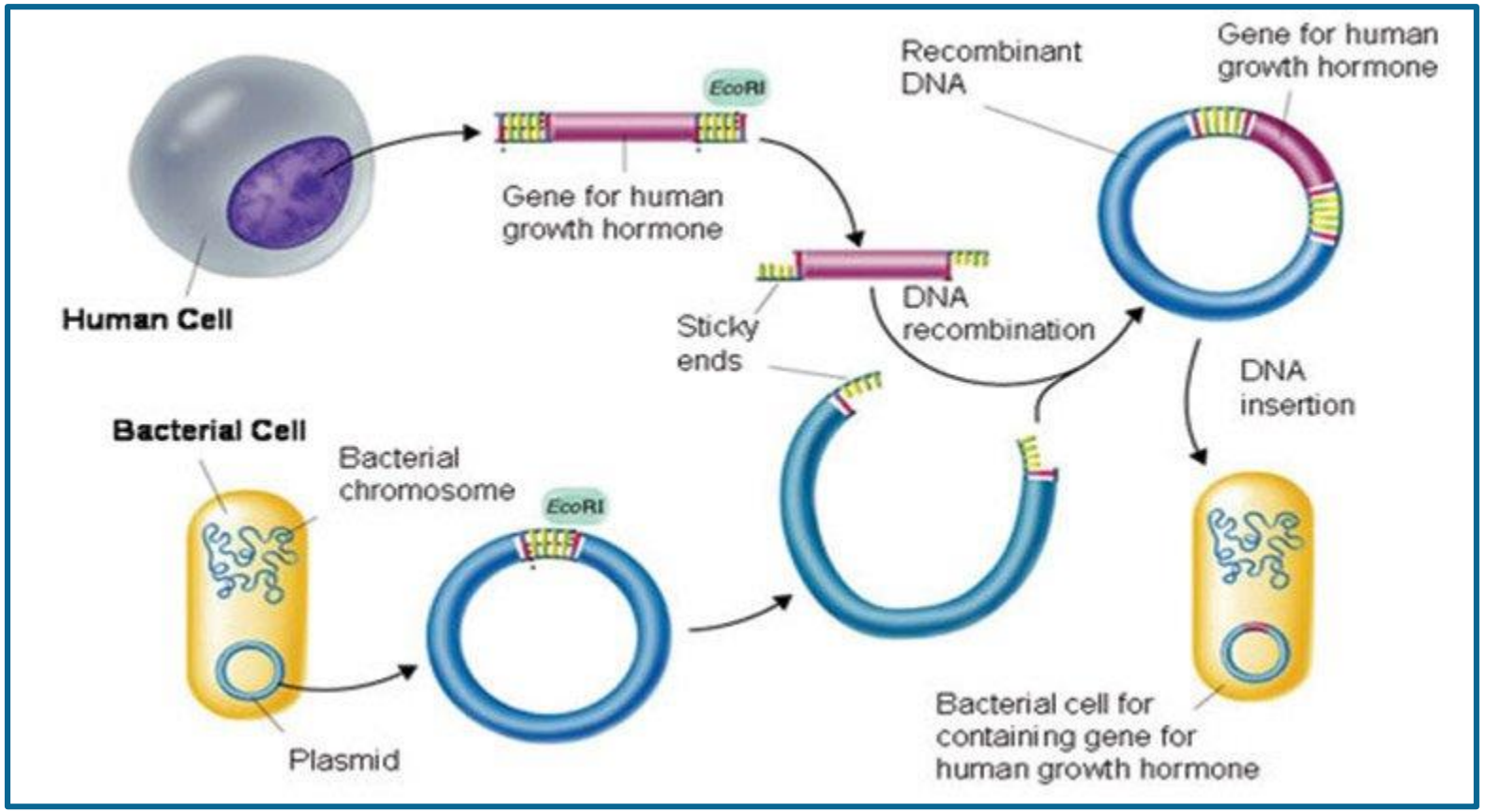
Human Cell
EcoRI
Gene for human growth hormone
Recombinant DNA
Gene for human growth hormone
Sticky ends
DNA recombination
DNA insertion
Bacterial Cell
Bacterial chromosome
EcoRI
Plasmid
Bacterial cell for containing gene for human growth hormone

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বা রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি নিচে উল্লেখ করা ধাপগুলো অবলম্বন করে সম্পন্ন করা হয়:

- ✓ প্রথমে দাতা জীব থেকে কাঙ্ক্ষিত জিনসহ DNA অণুকে পৃথক করা হয়। এরপর এই জিনের বাহক বা ক্যারিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার জন্য ব্যাকটেরিয়ার প্লাজমিড DNA পৃথক করা হয়। প্লাজমিড হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া কোষের ক্রোমোজোমের বাইরে আরেকটি স্বতন্ত্র DNA অণু যেটি বিভাজিত হতে পারে বা স্ববিভাজনে সক্ষম।
- ✓ এ ধাপে প্লাজমিড DNA এবং দাতা DNA কে রেস্ট্রিকশন এনজাইম দ্বারা খণ্ডিত করা হয়। দাতা DNA-র এসব খণ্ডের কোনো একটিতে কাঙ্ক্ষিত জিনটি থাকে।
- ✓ এ ধাপে লাইগেজ নামক একধরনের এনজাইম দিয়ে দাতা DNA এর খণ্ডকে প্লাজমিড DNA-এর কাটা প্রান্ত দুটোর মাঝখানে স্থাপন করা হয়। লাইগেজ এখানে আঠার মতো কাজ করে। এর ফলে নির্দিষ্ট জিনসহ রিকম্বিনেন্ট DNA প্লাজমিড তৈরি হয়। এই রিকম্বিনেন্ট প্লাজমিড এখন দাতা DNA এর খণ্ডিত অংশ বহন করে।
- ✓ এখন এই রিকম্বিনেন্ট প্লাজমিডকে ব্যাকটেরিয়ার ভেতরে প্রবেশ করানো হয়। খণ্ডিত DNA গ্রাহক কোষে প্রবেশ করানোর পদ্ধতিকে ট্রান্সফরমেশন বলে। ট্রান্সফরমেশনের ফলে নতুন জিন নিয়ে যে ব্যাকটেরিয়া বা জীবের উদ্ভব ঘটে, তাকে ট্রান্সজেনিক জীব বলে।
- ✓ নির্দিষ্ট জিন বহনকারী রিকম্বিনেন্ট প্লাজমিড ধারণ করা ব্যাকটেরিয়াকে শনাক্ত করে আলাদা করা হয়। এরপর নির্দিষ্ট জিন বহনকারী ব্যাক্টেরিয়াগুলোর ব্যাপক বংশবৃদ্ধি ঘটানো হয়। এই পদ্ধতিতে জিন তৈরি করাকে বলা হয় জিন ক্লোনিং। জিনকে ব্যবহার করার জন্য প্লাজমিডকে আবার আলাদা করে নেওয়া হয়। নতুন সৃষ্ট ব্যাক্টেরিয়াগুলোতে কাঙ্ক্ষিত জিন বিদ্যমান থাকে।

ক্লোনিং

➲ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যবহার করে তিন ধরনের ক্লোনিং করা হয়।

১. জিন ক্লোনিং

২. সেল ক্লোনিং

৩. জীব ক্লোনিং

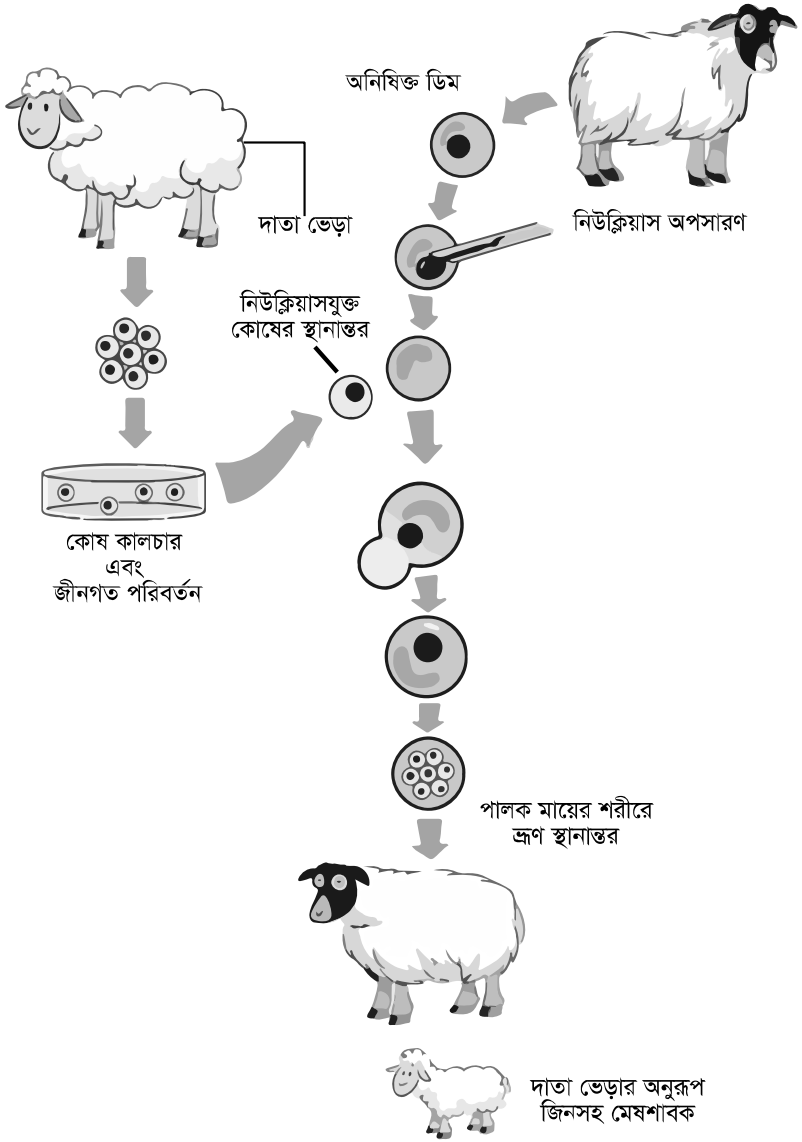

ক্লোনিং

❖ **ট্রান্সজেনিক প্রাণী:** জিন প্রকৌশলের মাধ্যমে জিনের স্থানান্তর ঘটিয়ে যেসব প্রাণী সৃষ্টি করা হয়, সেগুলোকে ট্রান্সজেনিক প্রাণী বলে। যেমন, মানুষের জিন বিশেষ পদ্ধতিতে ইঁদুরে প্রবেশ করিয়ে এমন ট্রান্সজেনিক ইঁদুর উৎপাদন সম্ভব হয়েছে, যা মানুষের অ্যান্টিবডিগুলো তৈরি করতে সক্ষম। একই পদ্ধতিতে ট্রান্সজেনিক গবাদিপশু, ভেড়া, ছাগল, শুকর, পাখি ও মাছ উৎপাদন করা হয়েছে।

❖ **ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ:** জিন প্রকৌশলের মাধ্যমে জিনের স্থানান্তর ঘটিয়ে যেসব উদ্ভিদ সৃষ্টি করা হয়, সেগুলোকে ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ বলে। রিকম্বিনেন্ট DNA কৌশল প্রয়োগ করে একটি কাঙ্ক্ষিত জিন উদ্ভিদদেহের কোষের প্রোটোপ্লাজমে প্রবেশ করানো হয়।

গুরুত্বপূর্ণ ও অর্থকরী ফসলকে ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদে পরিণত করে পতঙ্গ, ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক প্রতিরোধী করে উৎপাদন করা হচ্ছে। শৈত্য, লবণাক্ততা, খরা, নাইট্রোজেন ও ফাইটোহরমোন স্বল্পতা ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ উদ্ভাবন করে মোকাবিলা করা সক্ষম হয়েছে। বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রায় ৬০ টির মতো উদ্ভিদ প্রজাতিতে এ প্রক্রিয়ার সফল প্রয়োগ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে- টমেটো, তামাক, আলু, লেটুস, বাঁধাকপি, সয়াবিন, সূর্যমুখী, শসা, তুলা, মটর, গাজর, আপেল, মুলা, পেঁপে, ধান, গম, ভুট্টা ইত্যাদি। ট্রান্সজেনিক টমেটো উদ্ভাবন করে পাকা টমেটোর ত্বক নরম হওয়া প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, এগুলোকে বিলম্বে পাকানো এবং এর ভেতর সুক্রোজের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

কৃষি উন্নয়নে জৈবপ্রযুক্তির ব্যবহার

মানুষের অন্যতম প্রধান মৌলিক চাহিদা খাদ্য। কিন্তু সীমিত ভূখণ্ডে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা নিয়ে কীভাবে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া যায় কিংবা কীভাবে উদ্বৃত্ত খাদ্য উৎপাদন করে ব্যবসায়িক ফায়দা ওঠানো যায়, সেটি নিয়ে সারা পৃথিবীতে চলছে এক অঘোষিত যুদ্ধ। এ যুদ্ধ জয়ের হাতিয়ার হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে সফল জৈবপ্রযুক্তির প্রয়োগ। কৃষি উন্নয়নে যেসব জৈবপ্রযুক্তিগত পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়, সেগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলো:

- **টিস্যু কালচার:** এ পদ্ধতিতে উদ্ভিদের বর্ধনশীল অঙ্গের ক্ষুদ্র অংশ: যেমন- মূল, কাণ্ড, পাতা, অঙ্কুরিত চারার বিভিন্ন অংশ ইত্যাদি নির্ধারিত আবাদ মাধ্যমে জীবাণুমুক্ত ও নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে আবাদ করা হয়। এই কালচারের ফলে এসব বর্ধনশীল অঙ্গসমূহ থেকে অসংখ্য অণুচারা উৎপন্ন হয়। এসব অণুচারার প্রত্যেকটি পরে উপযুক্ত পরিবেশে পৃথক পৃথক পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদে পরিণত হয়। এ প্রযুক্তি ব্যবহার করে অল্প জায়গায় নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে বাণিজ্যিকভাবে লাখ লাখ কাঙ্ক্ষিত চারা তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে।
- **অধিক ফলনশীল উদ্ভিদের জাত সৃষ্টি:** কোনো বন্য উদ্ভিদের উৎকৃষ্ট জিন ফসলি উদ্ভিদে প্রতিস্থাপন করে কিংবা জিনের গঠন বা বিন্যাসের পরিবর্তন ঘটিয়ে উন্নত জাতের উদ্ভিদ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। এভাবে ধান, গম, তেলবীজসহ অনেক শস্যের অধিক ফলনশীল উন্নত জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে।
- **সুপার রাইস সৃষ্টি:** জৈবপ্রযুক্তির মাধ্যমে সুইডেনের এক বিজ্ঞানী সুপার রাইস বা গোল্ডেন রাইস নামক এক ধরনের ধান উদ্ভাবন করেছেন। এটি ভিটামিন A সমৃদ্ধ।
- **ভিটামিন সমৃদ্ধ ভুট্টার জাত সৃষ্টি:** স্পেনের একদল গবেষক জেনেটিকালি মডিফাইড ভুট্টার বীজ উদ্ভাবন করেছেন যাতে ভিটামিন সি, বিটা ক্যারোটিন ও ফলিক অ্যাসিড পাওয়া যাবে। এই ভুট্টা ব্যালেন্স ডায়েটের পাশাপাশি গরিব দেশগুলোর মানুষের অপুষ্টি দূর করবে।
- **ভিটামিন সমৃদ্ধ ধানের জাত সৃষ্টি:** বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল বিশ্বে ভিটামিন ঘাটতি একটি মারাত্মক জনস্বাস্থ্য সমস্যা। এজন্য জৈবপ্রযুক্তির মাধ্যমে জিংকসমৃদ্ধ ধানের জাত (ব্রি-৬২, ব্রি-৬৪, ব্রি-৭২ ব্রি-৮৪, ব্রি-১০০), ভিটামিন 'এ'-সমৃদ্ধ ধানের জাত (গোল্ডেন রাইস, ব্রি ২৯/জিআর-২) এবং বিভিন্ন উন্নয়নশীল ধান উদ্ভাবন হয়েছে।

ঔষধশিল্পে জৈবপ্রযুক্তির ব্যবহার

প্রতিবছর জনসংখ্যা ও রোগের জটিলতা বেড়েই চলছে। এ অবস্থায় দ্রুত চিকিৎসা পৌঁছে দিতে বিজ্ঞানীরা জৈবপ্রযুক্তি ব্যবহার করে ঔষধশিল্পের উন্নতি ঘটিয়েছেন। মারাত্মক রোগ-ব্যাধি শনাক্তকরণের পাশাপাশি জৈবপ্রযুক্তির মাধ্যমে ঔষধ উৎপাদনের প্রক্রিয়া জোরালো হয়েছে। নিচে তার কয়েকটির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলো।

- ✓ **ভ্যাকসিন উৎপাদন:** বর্তমানে জিন প্রকৌশল প্রযুক্তি প্রয়োগ করে ব্যাপকভাবে বিভিন্ন ভ্যাকসিন বা টিকা উৎপাদন করা হয়েছে যেগুলো পোলিও, যক্ষ্মা, হাম, বসন্তসহ বিভিন্ন সংক্রামক রোগের রোগ প্রতিরোধক হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

- ✓ **ইন্টারফেরন উৎপাদন:** ইন্টারফেরন আধুনিক ঔষধশিল্পে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রোটিন অণুর সমন্বয়ে গঠিত এ উপাদানটি দেহের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থায় অত্যন্ত সহায়ক। জিন প্রকৌশল প্রয়োগ করে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ইন্টারফেরন উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। এটি হেপাটাইটিসের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয় এবং ক্যান্সার রোগীদেরকে প্রাথমিকভাবে ইন্টারফেরন প্রয়োগ করে ক্যান্সারকে নিয়ন্ত্রণে রাখার পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

- ✓ **হরমোন উৎপাদন:** বিভিন্ন হরমোন (যেমন- ডায়াবেটিস রোগের ইনসুলিন কিংবা মানুষের দেহ বৃদ্ধির হরমোন ইত্যাদি) উৎপাদন জৈবপ্রযুক্তির একটি উল্লেখযোগ্য দিক। জৈবপ্রযুক্তির মাধ্যমে প্রস্তুত করা হরমোন সহজসাধ্য এবং দামও অনেক কম।

- ✓ **অ্যান্টিবায়োটিক উৎপাদন:** কম সময়ের মধ্যে বিপুল পরিমাণ অ্যান্টিবায়োটিক উৎপাদনের জন্য জৈবপ্রযুক্তির প্রয়োগ করে বর্তমানে এক হাজারের বেশি অ্যান্টিবায়োটিক উৎপাদিত হচ্ছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে পেনিসিলিন ও সেফালোস্পোরিন অ্যান্টিবায়োটিক।

DNA টেস্ট

DNA টেস্ট

[৪১তম, ৩৭তম, ৩৬তম, ৩৫তম বিসিএস লিখিত]

যখন কোনো সন্তানের পিতৃ বা মাতৃ পরিচয় নিয়ে বিরোধ সৃষ্টি হয় অথবা কেউ যদি কোনো সন্তানকে তার সন্তান হিসেবে দাবি করে, তখন DNA টেস্ট দ্বারা এ ধরনের বিবাদ নিষ্পত্তি করা যায়। DNA টেস্ট করার সময় পিতা, মাতা ও সন্তানের শরীর থেকে কোনো ধরনের জীবকোষ (রক্ত, লালা ইত্যাদি) সংগ্রহ করা হয়। সেখান থেকে নানা ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়ার দ্বারা পিতা, মাতা ও সন্তানের DNA এর একটি প্রোফাইল প্রস্তুত করা হয়। এরপর সন্তানের DNA এর চিত্রের সাথে পিতামাতার DNA চিত্র মিলানো হয় এবং যদি প্রত্যেকের সাথে প্রায় ৫০% মিল পাওয়া যায়, তাহলে সে সেই সন্তানের জৈব পিতামাতা (Biological Parents) অর্থাৎ প্রকৃত পিতামাতা হিসাবে গণ্য করা হয়।

ফরেনসিক টেস্ট

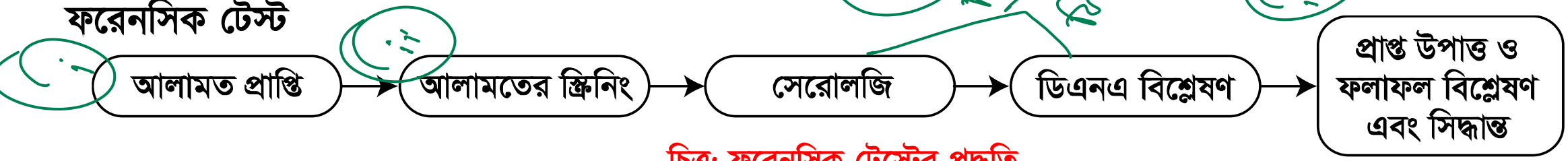

চিত্র: ফরেনসিক টেস্টের পদ্ধতি

ফরেনসিক টেস্টের দ্বারা রক্ত, বীর্যরস, মূত্র, অশ্রু, লালা ইত্যাদির DNA অথবা অ্যান্টিবডি থেকে অপরাধীকে শনাক্ত করা সম্ভব হয়।

DNA টেস্ট

জৈবপ্রযুক্তি প্রয়োগ করে ফরেনসিক টেস্ট করার পদ্ধতি নিম্নরূপ:

সেরোলজি (Serology) টেস্ট দিয়ে মানুষের রক্ত, বীর্য এবং লালাকে চিহ্নিত করে তার DNA বিশ্লেষণ করে অপরাধীকে শনাক্ত করা হয়। এ পর্যন্ত জিন প্রকৌশলের প্রয়োগ ও অবদান সম্পর্কে যেসব আলোচনা করা হয়েছে, এগুলো ছাড়াও আরও অনেক ধরনের কাজ হয়েছে। জিন প্রকৌশল প্রযুক্তি ব্যবহার করে "হিউম্যান জিনোম প্রজেক্ট"-এর মাধ্যমে বিভিন্ন ক্রোমোজোমে অবস্থিত জিনগুলোর অবস্থান ও কাজ সম্বন্ধে জানা সম্ভব হয়েছে। এর ফলে মানুষের শরীরের ক্ষতিকর জিনকে অপসারণ করে সুস্থ জিন প্রতিস্থাপন করা সম্ভব হতে যাচ্ছে। এই পদ্ধতিকে থেরাপি বলে।

ফরেনসিক DNA প্রোফাইলিং বা DNA ফিঙ্গার প্রিন্টিং:

DNA test এর একটি অত্যাধুনিক পদ্ধতি হচ্ছে DNA প্রোফাইলিং। এ পদ্ধতিতে একাধিক ব্যক্তির মধ্যে সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য খোঁজার জন্য ব্যক্তিদ্বয়ের DNA-এর বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের মধ্যে তুলনা করা হয়। DNA পরীক্ষার পদ্ধতিকে প্রথম DNA ফিঙ্গার প্রিন্টিং পদ্ধতি বলা হলেও পরবর্তীতে এ পরীক্ষা পদ্ধতিকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। এর কয়েকটি নাম হলো- জেনেটিক ফিঙ্গার প্রিন্টিং, DNA testing, DNA টাইপিং ইত্যাদি। তবে বর্তমানে একে DNA প্রোফাইলিং নামে অভিহিত করা হয়।

DNA টেস্ট

ফিংগার প্রিন্ট রিকগনিশন সিস্টেম:

এটি বায়োমেট্রিক সিস্টেমে ব্যক্তি শনাক্তকরণের জন্য সর্বাধিক পরিচিত এবং ব্যবহৃত বায়োমেট্রিক সমাধান। ফিঙ্গারপ্রিন্ট প্রাচীনতম এবং সর্বাধিক জনপ্রিয় রিকগনিশন সিস্টেম। প্রতিটি মানুষের আঙ্গুলের ছাপ বা ফিঙ্গার প্রিন্ট পৃথক যা পৃষ্ঠ, খাঁজ এবং রেখার দিক এর সমন্বয়ে গঠিত। পৃষ্ঠের তিনটি মৌলিক প্যাটার্ন রয়েছে যথা: খিলান, লুপ এবং ঘূর্ণি আকৃতির। এই বৈশিষ্ট্যগুলির পাশাপাশি বিভাজন এবং দাগগুলি দ্বারা ফিঙ্গারপ্রিন্টের স্বতন্ত্রতা নির্ধারিত হয়। ফিঙ্গার প্রিন্ট রিডার আলোক-সংবেদনশীল মাইক্রোচিপ ব্যবহার করে ফিঙ্গার প্রিন্টের ডিজিটাল চিত্র তৈরি করে। তারপর কম্পিউটার ফিঙ্গার প্রিন্টের ডিজিটাল চিত্রটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্বাচন করে বিশ্লেষণ করে এবং প্যাটার্ন-ম্যাচিং সফ্টওয়্যার ব্যবহার করে ডেটাবেজে সংরক্ষিত ফিঙ্গার প্রিন্টের নমুনার সাথে তুলনা করে কোন ব্যক্তিকে চিহ্নিত করে। ফিঙ্গার প্রিন্ট রিডার এমন একটি বায়োমেট্রিক ডিভাইস যা কোনো ফিঙ্গার প্রিন্টকে ইনপুট হিসাবে নেয় এবং ডেটাবেজে সংরক্ষিত ফিঙ্গার প্রিন্টের নমুনার সাথে তুলনা করে।

DNA টেস্ট

সুবিধা:

- ✓ খরচ তুলনামূলক কম।
- ✓ শনাক্তকরণের জন্য সময় কম লাগে।
- ✓ এটি সবচেয়ে আধুনিক পদ্ধতি।
- ✓ এটি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য এবং সুরক্ষিত।
- ✓ এটি মেমোরির জায়গা কম নেয়।

অসুবিধা:

- ✓ আঙ্গুলে কোন প্রকার আস্তর লাগানো থাকলে শনাক্তকরণে সমস্যা হয়।
- ✓ ছোট বাচ্চাদের জন্য উপযুক্ত নয়।

ব্যবহার:

- ✓ কোন প্রোগ্রাম বা ওয়েবসাইটে ইউজার নেইম এবং পাসওয়ার্ডের পরিবর্তে।
- ✓ প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণে।
- ✓ ব্যাংকিং পেমেন্ট সিস্টেমে।
- ✓ পরিচয়পত্র শনাক্ত করার কাজে।

DNA টেস্ট

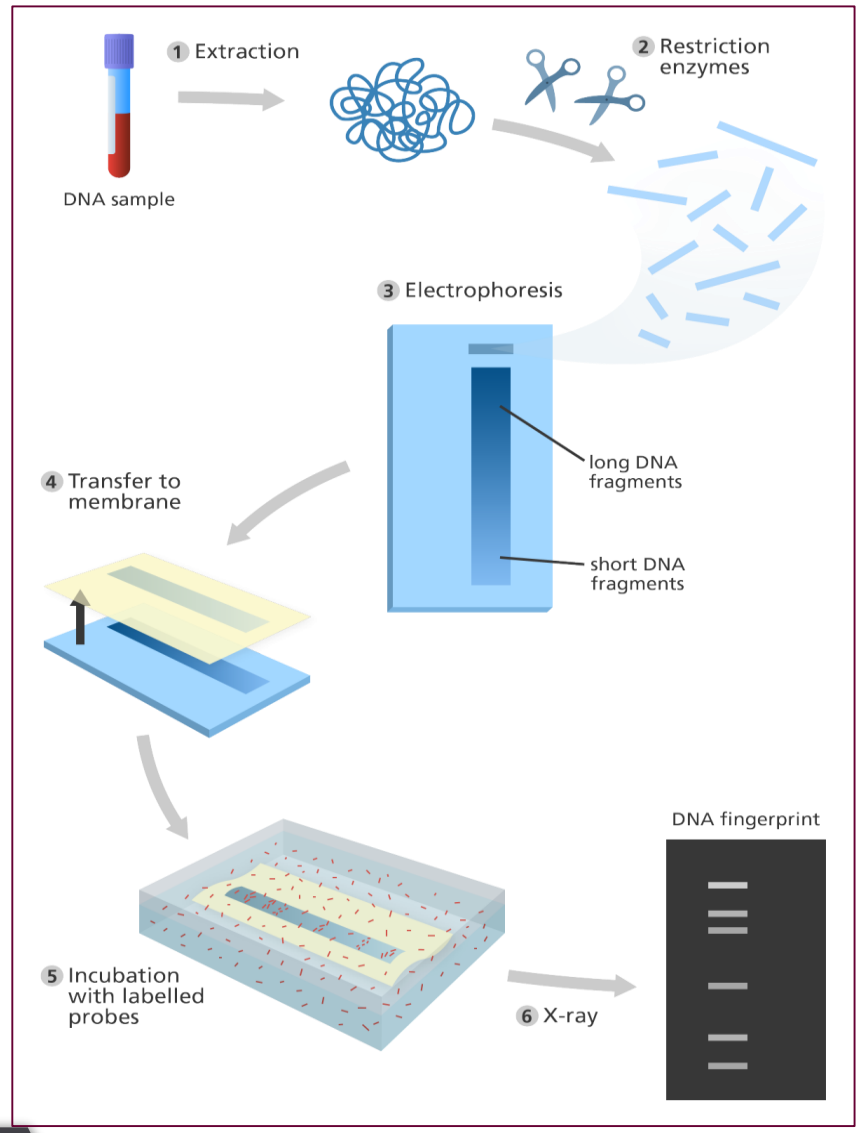
1 Extraction
2 Restriction enzymes
DNA sample
3 Electrophoresis
long DNA fragments
short DNA fragments
4 Transfer to membrane
DNA fingerprint
5 Incubation with labelled probes
6 X-ray

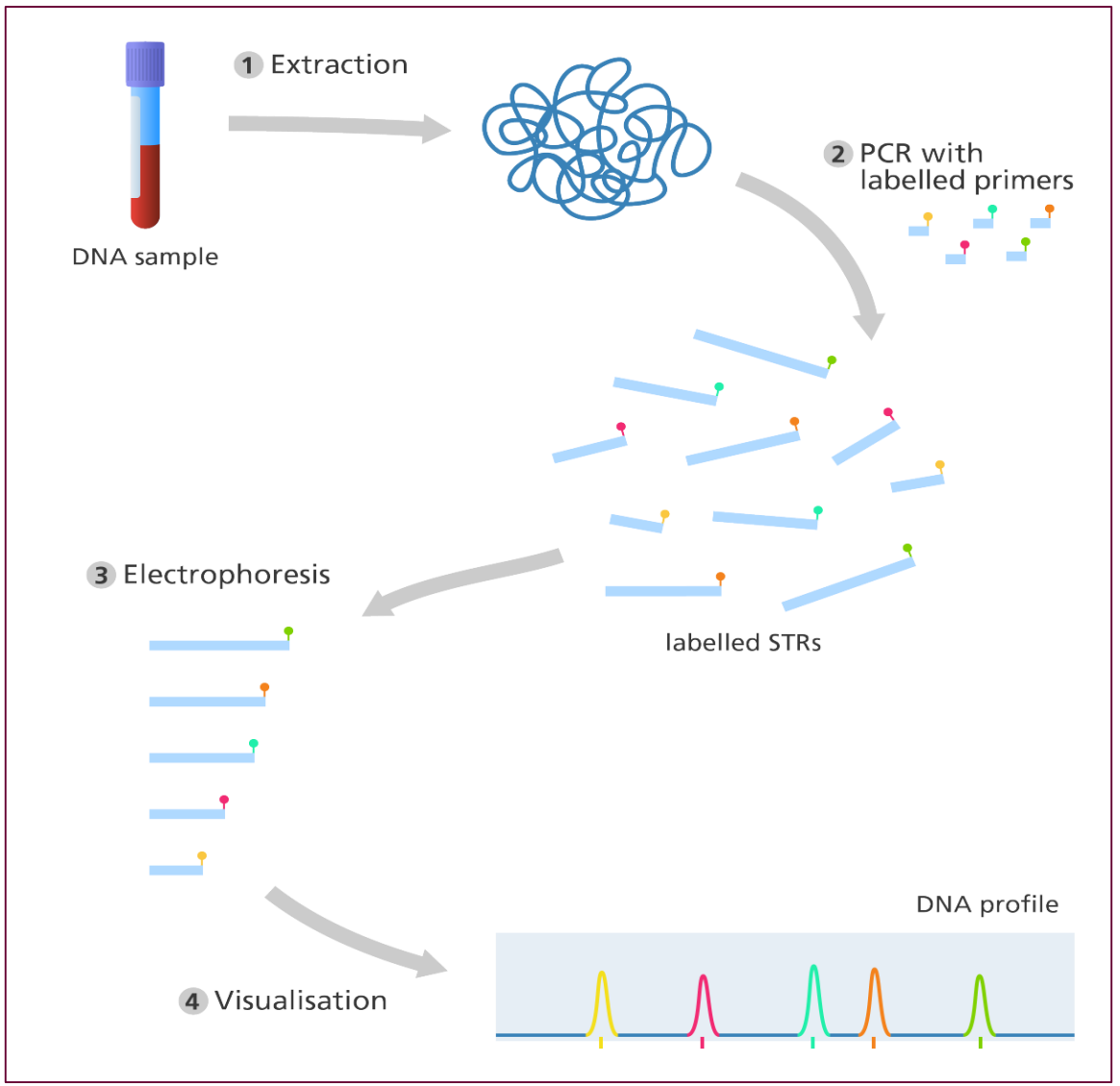
1 Extraction
DNA sample
2 PCR with labelled primers
labelled STRs
3 Electrophoresis
DNA profile
4 Visualisation

জিন থেরাপি

জিন থেরাপি

[৩৬তম বিসিএস লিখিত]

প্রত্যেকটা জীবদেহ অসংখ্য কোষ দিয়ে তৈরি এবং প্রত্যেকটা কোষ নির্দিষ্ট ও সমপরিমাণ জিন বহন করে। ত্রুটিপূর্ণ জিন দ্বারা উৎপাদিত প্রোটিনও ত্রুটিযুক্ত হবে এবং ফলাফল হিসাবে এর প্রভাব পড়বে বৈশিষ্ট্য প্রকাশে। এভাবে জিনের পরিবর্তনের কারণে বিভিন্ন প্রকার রোগের সৃষ্টি হতে পারে। থেরাপি এক ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি যার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার বংশগত রোগ নিরাময় করা হয়। অন্যভাবে বললে জিন প্রকৌশলের (Genetic Engineering) মাধ্যমে মানুষের ত্রুটিপূর্ণ কোন জিনকে স্বাভাবিক জিন দ্বারা প্রতিস্থাপন করাকে জিন থেরাপি (Gene Therapy) বলে। কিছু মারাত্মক রোগ যেমন- ক্যান্সার, হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, হিমোফিলিয়া, এইডস ইত্যাদি রোগের চিকিৎসায় জিন থেরাপি দেওয়া হয়।

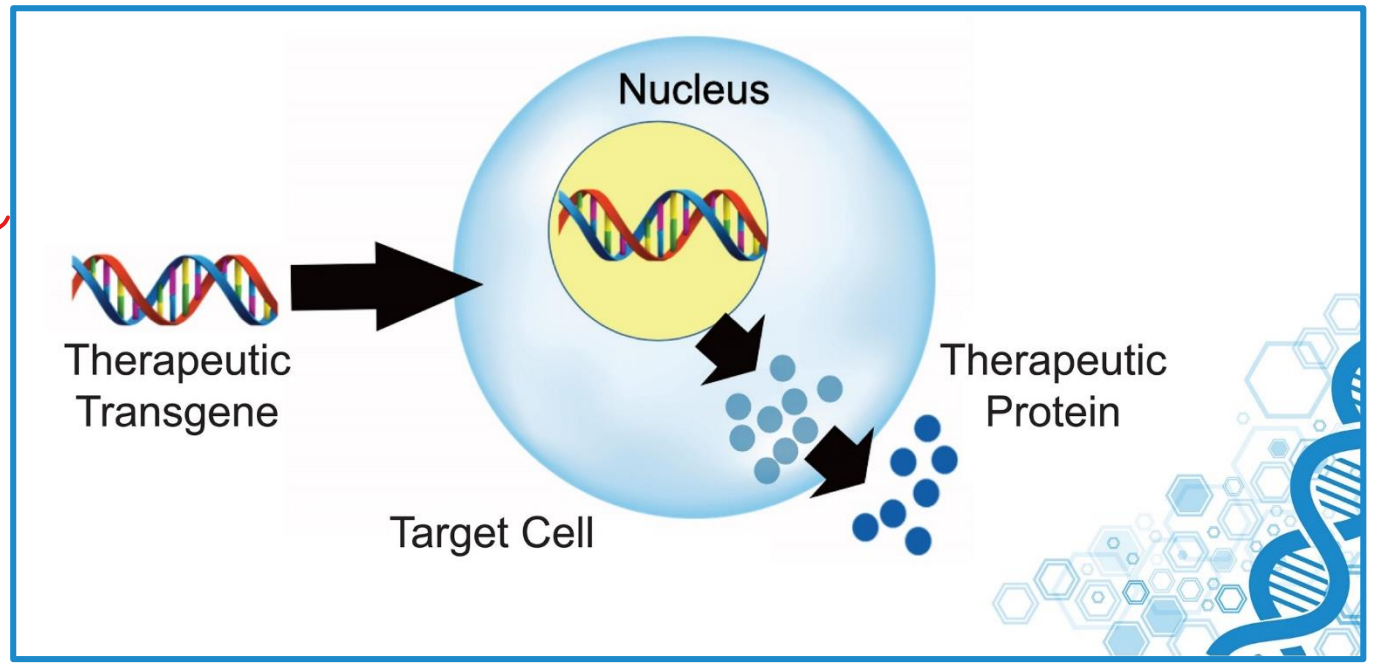

জিন থেরাপির মূল প্রক্রিয়া

➲ সাধারণত তিন ধরনের ভাইরাস কে জিন থেরাপিতে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

১. রেট্রোভাইরাস (Retrovirus)

২. এডিনোভাইরাস (Adenovirus)

৩. এডিনো-এসোসিয়েটেড ভাইরাস (Adeno-Associated Virus)।

➲ জিন থেরাপি ২ প্রকার--

১. জার্ম-লাইন থেরাপি

২. সোমাটিক সেল থেরাপি।

GMO

Genetically Modified Organism হচ্ছে এমন ধরনের organism, যার জেনেটিক উপাদান জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। GMO এর উৎস হচ্ছে জেনেটিক্যালি মডিফাইড খাদ্য এবং এটি বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

বর্তমানে জেনেটিক মডিফিকেশনের মাধ্যমে বিভিন্ন ফসলের রোগ বালাই প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি ও উৎপাদনে উন্নয়ন সাধন করা সম্ভব হয়েছে। পৃথিবী জুড়ে এখন প্রায় ৩০টি দেশ GM ফসল (Genetically Modified Crop) উৎপাদন করছে। ২০১৪ সালের ২২ জানুয়ারি, বাংলাদেশে প্রথম একটি GM খাদ্য ফসল (Bt-বেগুন) চাষের জন্য সরকার অনুমোদন দিয়েছে। এর চারটি জাত নির্বাচিত কৃষকের কাছে বিতরণ করা হয়েছে।

Bt-বেগুন: Basillus thuringiensis নামক একটি সয়েল ব্যাকটেরিয়া থেকে ক্রিস্টাল প্রোটিন জিন, বেগুনের জিনোমে অন্তর্ভুক্ত করে উৎপন্ন বেগুনের নাম দেয়া হয়েছে Bt-বেগুন।

প্রতিটি জিন একটি নির্দিষ্ট প্রোটিন তৈরি করে এবং ঐ প্রোটিনই ঐ জিনের বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটায়। কাজেই Bt-ক্রিস্টাল জিনও একটি নির্দিষ্ট প্রোটিন তৈরি করবে। পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে, Bt-জিন বিশেষ পোকার জন্য বিষাক্ত হলেও মানুষের জন্য বিষাক্ত নয়। এছাড়া Bt-বেগুন উদ্ভাবনের পর পৃথিবীর উন্নত দেশে ১০টির অধিক গবেষণাগারে মাছ, মুরগি, ছাগল, খরগোশ, ইঁদুর ইত্যাদি প্রাণীর উপর গবেষণায় কোনো ক্ষতিকর প্রভাব প্রতীয়মান হয়নি। তাই বলা যায়, Bt-বেগুন খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করা নিরাপদ।

সাধারণ বেগুন ও Bt-বেগুনের মধ্যে পার্থক্য: সাধারণ বেগুন ও Bt-বেগুনের মধ্যে পার্থক্য হলো এক প্রকার পোকা সাধারণ বেগুন গাছের কচি ডগা ও ফল ছিদ্র করে নষ্ট করে ফেলে যার ফলে ফলন দারুণভাবে হ্রাস পায়। পোকার আক্রমণ থেকে ফসল রক্ষা করার জন্য কৃষককে প্রতি সিজন-এ ৬০—১৮০ বার পোকানাশক ঔষধ স্প্রে করতে হয়। Bt-বেগুনে ঐ পোকার আক্রমণ হয় না, তাই পোকানাশক ঔষধও স্প্রে করতে হয় না।

ন্যানো টেকনোলজি

বর্তমানেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে ন্যানো প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে। নিম্নে কতিপয় প্রয়োগক্ষেত্র উল্লেখ করা হলো:

- ✓ **ন্যানো রোবট তৈরিতে:** ন্যানো প্রযুক্তি ব্যবহার করে অতি ক্ষুদ্র রোবট তৈরির গবেষণা চলছে।
- ✓ **ঔষধ তৈরিতে:** ঔষধ তৈরির আণবিক গঠন, যাতে রোগাক্রান্ত সেলে সরাসরি ঔষধ প্রয়োগ করা যায়।
- ✓ **কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তৈরিতে:** ন্যানো প্রযুক্তি ব্যবহার করে অনুভূতিসম্পন্ন কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তৈরি করা সম্ভব।
- ✓ **বাতাস পরিশোধনে:** শিল্প কারখানা হতে নির্গত ক্ষতিকারক ধোঁয়াকে ন্যানো টেকনোলজির মাধ্যমে পরিশোধন করে অক্ষতিকর গ্যাসে পরিণত করতে পারে।

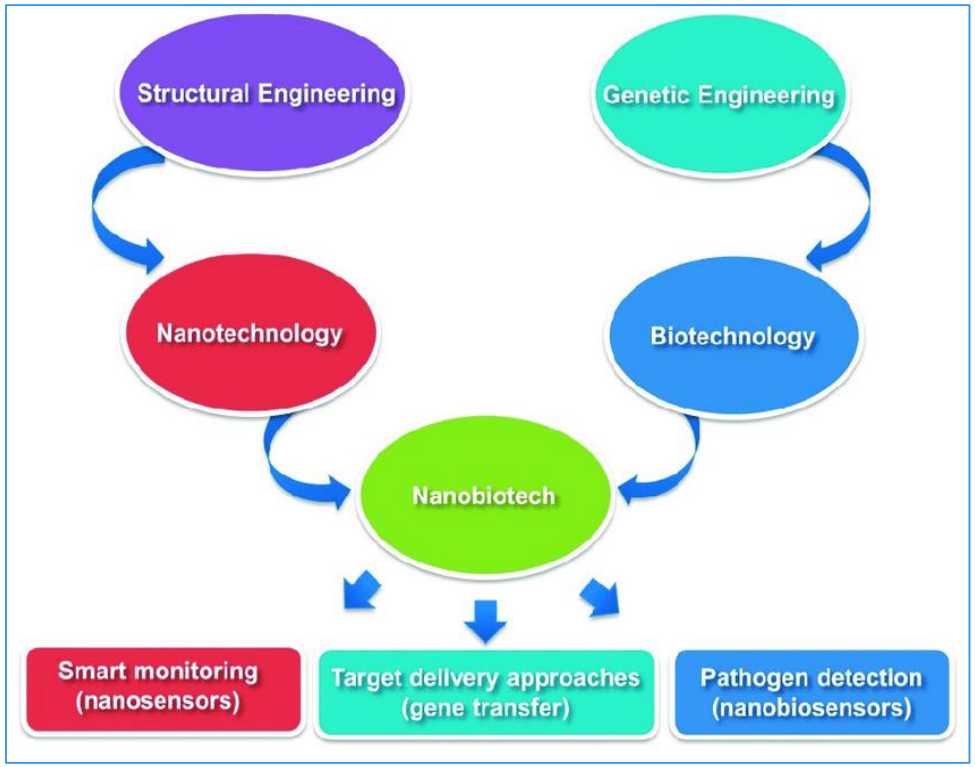

ন্যানো টেকনোলজি

- ✓ **ক্যান্সার রোগ নির্ণয় ও নিরাময়:** ন্যানোসেন্সর ব্যবহার করে মানবদেহের রক্তের ভেতরে ক্যান্সার সৃষ্টিকারী উপাদান বায়োমার্কারের মাধ্যমে সম্পূর্ণভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে। ন্যানো সূঁচ ব্যবহার করে সূক্ষ্মভাবে শুধুমাত্র ক্যান্সার আক্রান্ত কোষে ঔষধ প্রয়োগ করে ক্যান্সার কোষ ধ্বংস করা যাচ্ছে।
- ✓ **কম্পিউটার হার্ডওয়্যার তৈরিতে:** কম্পিউটারের মেমোরি, গতি, দক্ষতা ইত্যাদি বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন হার্ডওয়্যার এবং ভিডিও গেমস কনসোল তৈরিতে ন্যানো প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে।
- ✓ **ইলেকট্রনিক্স শিল্পে:** বিদ্যুৎ খরচ, ওজন এবং আকৃতি কমিয়ে কার্যক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতি তৈরিতে ন্যানো প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে।
- ✓ **রাসায়নিক শিল্পে:** সানস্ক্রিন এ ব্যবহৃত টাইটেনিয়াম ডাই-অক্সাইড তৈরির কাজে ন্যানো প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে।
- ✓ **মহাকাশ অভিযানে:** মহাকাশ অভিযানে ব্যবহৃত বিভিন্ন নভোযানকে হালকা করে তৈরি করে জ্বালানির পরিমাণ কমাতে ন্যানো প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে।

ফার্মাকোলজি

নিম্নে ফার্মাকোলজির কতিপয় প্রয়োগক্ষেত্র উল্লেখ করা হলো:

- ✓ বিভিন্ন ধরনের এন্টিবায়োটিক তৈরি করতে। যেমন: Penicillium notatum (ছত্রাক থেকে পেনিসিলিন), Streptomyces Venezuelae (উদ্ভিদ) থেকে ক্লোরোমাহা ইত্যাদি।
- ✓ এন্টিসেপটিক তৈরি করতে।
- ✓ শ্বাসকষ্টের ঔষধ তৈরি করতে। যেমন: যষ্টিমধু হতে শ্বাসকষ্টের ঔষধ তৈরি করা হয়।
- ✓ উচ্চ রক্তচাপের ঔষধ তৈরিতে।
- ✓ হৃদরোগের ঔষধ তৈরিতে। যেমন: অর্জুন গাছের বাকল হতে হৃদরোগের ঔষধ প্রস্তুত করা হয়।
- ✓ যকৃতের ঔষধ তৈরি করতে। যেমন: যকৃতের সমস্যায় কালমেঘ নামক গাছ হতে ঔষধ তৈরি করা হয়।
- ✓ বৃক্কের ঔষধ তৈরিতে। যেমন: পূর্ণনভা গাছের মূল, কাণ্ড ও পাতা হতে মূত্রদোষ, বৃক্কের গোলযোগের ঔষধ প্রস্তুত করা হয়।

এছাড়াও হাঁপানি ও হুপিংকাশি, সর্দিকাশি ও জ্বর, গ্যাস্ট্রিক আলসার, আমাশয়, কৃমিনাশক, বাত ইত্যাদির ঔষধ প্রস্তুত করতে Pharmacology'র প্রয়োগ রয়েছে।

PHARMACOKINETICS

➲ Pharmacokinetics হলো শরীরে ওষুধের বিন্যাস সংক্রান্ত বিদ্যা যেখানে ওষুধ কীভাবে রক্তরসে ঘনত্বের পরিবর্তন ঘটায় তা নিয়ে আলোচনা করা হয়। শরীরে যখন কোনো ওষুধের ডোজ প্রয়োগ করা হয় তখন রক্তরস ঘনত্ব বাড়তেও পারে আবার কমতেও পারে। এই বৃদ্ধি বা হ্রাস তিনটি প্রক্রিয়ার গতি অনুযায়ী হয়ে থাকে এবং এই প্রক্রিয়া তিনটি হলো ওষুধ শোষণ, বণ্টন এবং বর্জন। অন্যভাবে বলা যায়, Pharmacokinetics হলো এমন এক বিদ্যা যেখানে ওষুধের শোষণ, বণ্টন, বিপাক এবং রেচন সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়। ফার্মাকোকাইনেটিকস বা ওষুধ গতিবিদ্যার মৌলিক বা প্রাথমিক ধারণাটি হচ্ছে ওষুধ অপসারণ অর্থাৎ শরীর থেকে ওষুধ বর্জন যা কিনা ক্রিয়েটিন অপসারণের ধারণার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

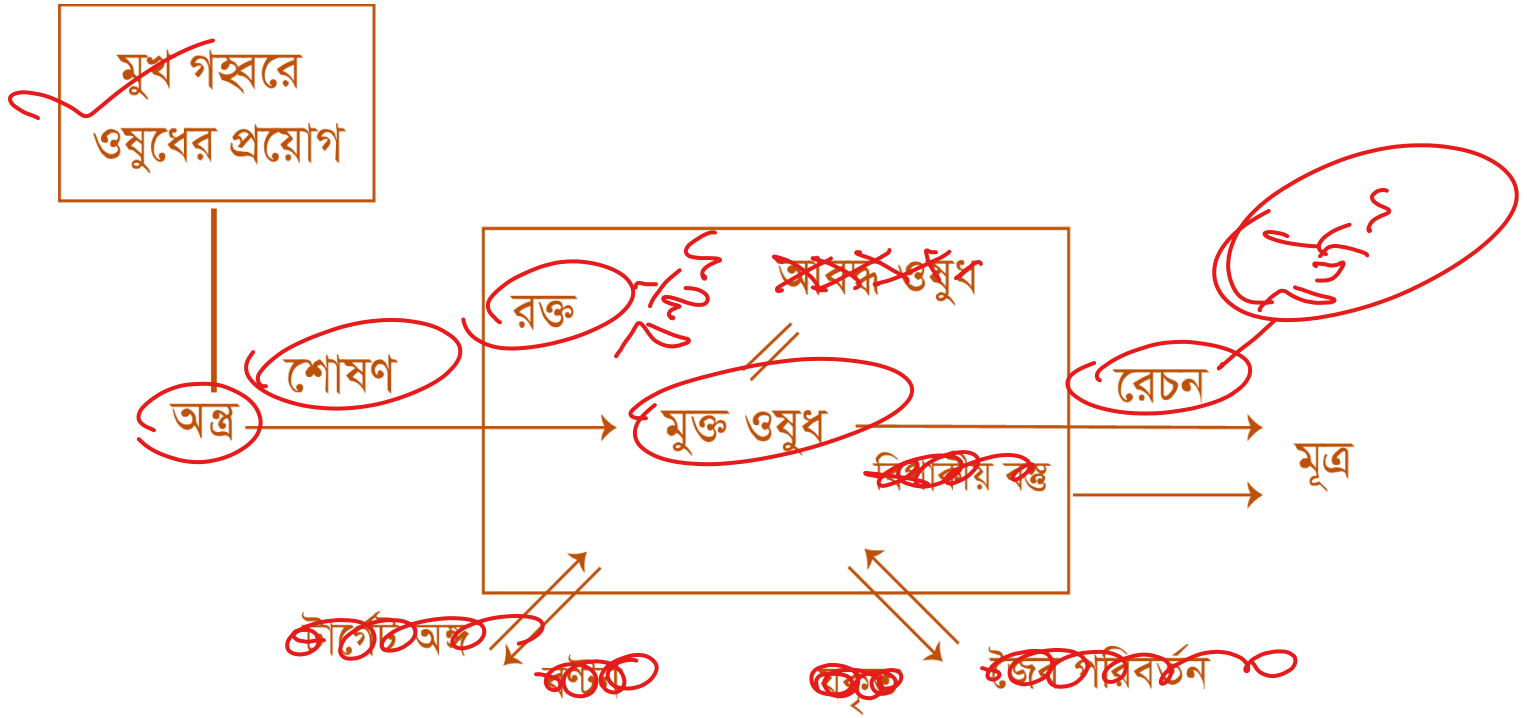

হরমোন

হরমোন

[৩৭তম বিসিএস লিখিত]

অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত এক বিশেষ ধরনের জৈব রাসায়নিক পদার্থ, যা সরাসরি রক্তে মিশে রক্ত সঞ্চালনের মাধ্যমে দেহের জৈব কার্যসমূহ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে তাকে হরমোন বা প্রাণরস বলে।

মানবদেহের বিকাশে বিভিন্ন হরমোনের গুরুত্ব:

- ✓ **গ্রোথ হরমোন:** দেহ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। এর অভাবে মানুষ বেঁটে হয়।
- ✓ **প্রোল্যাকটিন হরমোন:** স্তন বর্ধনে এবং দুগ্ধ নিঃসরণে সহায়তা করে।
- ✓ **থাইরক্সিন হরমোন:** দেহের বিপাকে সহায়তা করে।
- ✓ **অ্যাড্রেনালিন হরমোন:** জরুরি বিপাকক্রিয়ায় সাহায্য করে। বিপদ মোকাবিলায় সহায়তা করে।
- ✓ **ইনসুলিন:** রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ কমায় এবং শর্করা বিপাক নিয়ন্ত্রণ করে। এর অভাবে ডায়াবেটিস রোগ হয়।
- ✓ **গ্লুকানন:** রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বাড়ায়।
- ✓ **টেস্টোস্টেরন:** পুরুষের আনুষঙ্গিক যৌন বৈশিষ্ট্য প্রকাশে সহায়তা করে এবং শুক্রাণু উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে।
- ✓ **ইস্ট্রোজেন ও প্রজেস্টেরন:** স্ত্রীলোকের আনুষঙ্গিক যৌন বৈশিষ্ট্য প্রকাশে সহায়তা করে এবং প্লাসেন্টা গঠনে সহায়তা করে।

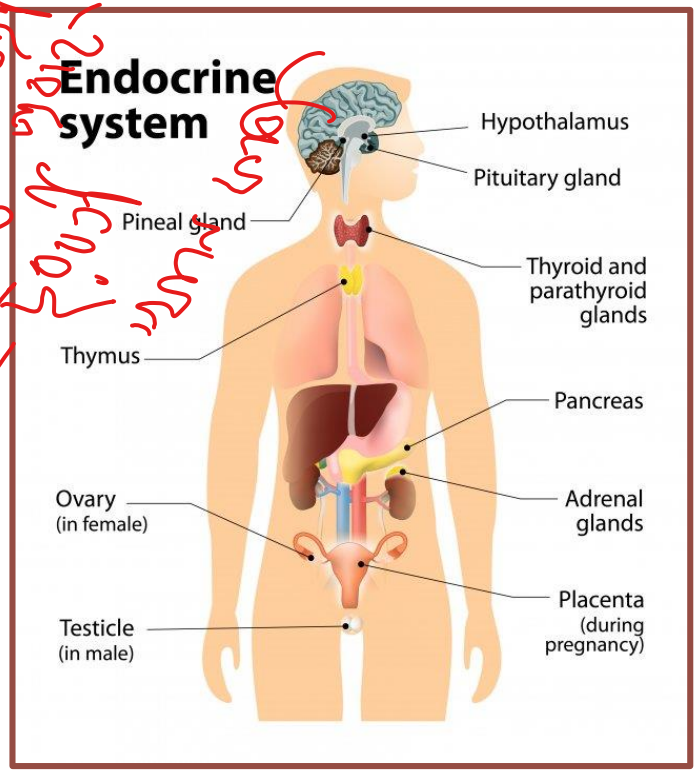

এনজাইম

সমস্ত জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতি ও হার কতকগুলি প্রোটিন জাতীয় যৌগ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এ প্রকার প্রোটিন জাতীয় যৌগগুলিকেই উৎসেচক বা এনজাইম (Enzyme) বলে। যে প্রোটিন জাতীয় পদার্থ অতি অল্প মাত্রায় বিদ্যমান থেকে জীবদেহে বিক্রিয়ার হারকে ত্বরান্বিত করে কিন্তু বিক্রিয়ার পরে নিজে অপরিবর্তিত থাকে, তাকে এনজাইম বলে। বিভিন্ন প্রকার ছত্রাক যেমন- Aspergillus, Penicillium, Muco, Rhizopus ইত্যাদি থেকে শিল্পভিত্তিক এনজাইম তৈরি করা হচ্ছে।

ব্যবহার: এনজাইম উৎপাদন প্রযুক্তির গুরুত্ব এনজাইমকে বিভিন্ন কাজে লাগিয়ে নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে। শিল্পজাত বিভিন্ন দ্রব্যাদির গুণগত মান নিয়ন্ত্রণে এনজাইমের ভূমিকা অনেক। ব্যাকটেরিয়া থেকে প্রাপ্ত প্রোটিয়েজ এনজাইম চামড়াশিল্পে, চামড়া থেকে পশম বিমুক্তকরণে ব্যবহৃত হয়। চামড়ার গুণগত মান উন্নয়নে প্রোটিয়েজের ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া গ্লু (আঠা) তৈরিতে, জামাকাপড়ের দাগ পরিষ্কারে, সিল্ক শোধনে, লিনেন-এর উৎকৃষ্ট তন্তু তৈরিতে প্রোটিয়েজ এনজাইম ব্যবহার করা হয়। ব্যাকটেরিয়া থেকে জাইমেজ এনজাইম তৈরি হয়, যা ফারমেন্টেশন বা গাঁজান প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন প্রকার স্টার্চ ও কার্বোহাইড্রেট হতে অ্যালকোহল তৈরি করা হয়। Bacillus subtilis থেকে অ্যামাইলেজ ও প্রোটিয়েজ এনজাইম উৎপন্ন হয়, যা বিভিন্ন ফলের রস বা ফলের গুণগত মান উন্নয়নে ব্যবহৃত হয়।

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

- জিন ক্লোনিং কী? [৪৪তম বিসিএস লিখিত]
- চিকিৎসা ও কৃষিক্ষেত্রে জিন ক্লোনিং পদ্ধতির গুরুত্ব বর্ণনা করুন। [৪৪তম বিসিএস লিখিত]
- ডিএনএ ও আরএনএ বলতে কী বোঝায়? [৪৩তম বিসিএস লিখিত]
- ক্রোমোজোমের রাসায়নিক গঠন লিখুন। [৪১তম বিসিএস লিখিত]
- কৃষি উন্নয়নে জীন প্রযুক্তির গুরুত্ব আলোচনা করুন। [৪১তম বিসিএস লিখিত]
- জৈবপ্রযুক্তি ও ন্যানোপ্রযুক্তি কী? জৈবপ্রযুক্তি ও ন্যানোপ্রযুক্তির প্রয়োগ ক্ষেত্রগুলো বর্ণনা করুন। [৪০তম বিসিএস লিখিত]
- জিন কী? জৈব প্রযুক্তি ও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মধ্যে সম্পর্ক কী? [৩৮তম বিসিএস লিখিত]
- ডি.এন.এ. ও আর.এন.এ. এর মধ্যে পার্থক্য লিখুন। জিন থেরাপি কী? [৩৮তম বিসিএস লিখিত]
- বাংলাদেশে GMO শস্য উৎপাদনের সুবিধা-অসুবিধা আলোচনা করুন? [৩৮তম বিসিএস লিখিত]

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

- মানুষের দেহকোষে কয়টি ক্রোমোজোম থাকে? এদের মধ্যে কয়টি সেক্স ক্রোমোজোম? [৩৫তম বিসিএস লিখিত]

  (ক) জিন (gene) বলতে কী বোঝায়? জেনেটিক বিশৃঙ্খলার দুটি কারণ লিখুন।

  (খ) DNA টেস্টের মাধ্যমে বিবাদমান দম্পতির পিতৃপরিচয় কীভাবে নিশ্চিত করা যায়?

  (গ) কৃষিবিজ্ঞানে GMO-এর ভূমিকা বিশ্লেষণ করুন।

- ক্রোমোজোম ও জিনের মধ্যে পার্থক্য কী কী? [২৪তম বিসিএস লিখিত]
- টিস্যু কালচার বলতে কী বোঝেন? [২২তম বিসিএস লিখিত]
- বায়োটেকনোলজি কী? [২১তম বিসিএস লিখিত]
- জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর একটি প্রয়োগ বর্ণনা করুন। [২০তম বিসিএস লিখিত]

BCS কঠিন নয়;
প্রস্তুতি যদি গোছানো হয়